সোম সংবাদ

dbss2000in@proton.me

New Town, Kolkata 156. 27th October . 2025.

সোম সংবাদ

২৭ অক্টোবর, ২০২৫

দেবাশিস চক্রবর্ত্তী, dbss2000in@proton.me
কলকাতা ১৫৬

সূচিপত্র

সূচিপত্র
অস্তিত্বের সন্ধানে বাংলা ভাষা
ল্যুভর লুণ্ঠন ২০২৫
জলচিহ্ন
বুরেভেস্টনিক পারমাণবিক ক্রুজ - অক্টোবর ২০২৫
মাটির হাঁড়ির ঘ্রাণ
প্রযুক্তিগত ভবিষ্যৎ উন্মোচন
নদীর নামে একদিন
বৈশ্বিক বাণিজ্য নীতির উত্থান
যখন সময় ফেরে
বাণিজ্য সংঘাত: কুয়ালালামপুর কাঠামো (অক্টোবর ২০২৫)
পথে পথে - কালিম্পঙ
গ্রামীণ নবজাগরণ: স্টার্টআপ, স্বনির্ভরতা ও কর্মসংস্থান
আধুনিক জীবনে প্রবীণ নাগরিক
যে শহর ঘুমোয় না
✍️ পাঠকের কলম / পাঠকপত্র

অস্তিত্বের সন্ধানে বাংলা ভাষা

- দেবাশিস চক্রবর্ত্তী

বাংলা ভাষার বর্তমান সংকট কেবল একটি যোগাযোগ মাধ্যমের সমস্যা নয়, বরং এটি বাঙালির আত্মপরিচয়, সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব এবং মনস্তাত্ত্বিক স্বাধীনতার মূল চ্যালেঞ্জ। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে যে ঐতিহাসিক অঙ্গীকার সৃষ্টি হয়েছিল, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও তা সর্বস্তরে প্রতিফলিত হয়নি। বরং, শিক্ষাঙ্গন, বিচারিক ক্ষেত্র এবং উচ্চশিক্ষায় ভিনদেশি ভাষার প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরতা এক গভীর 'আত্ম-উপহাসের চক্রে' (The Cycle of Self-Derision) আবর্তিত হচ্ছে। বছরে একবার ভাষাশহীদদের স্মরণ করা হয়, কিন্তু বাকি সময় অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার নামে বাংলাকে অবহেলা করার দ্বৈতনীতি নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করছে। তারা কার্যত এই বার্তা পাচ্ছে যে, বাংলা ভাষার ব্যবহার আবেগগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও অর্থনৈতিক সাফল্যের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারিক গুরুত্ব কম।

বর্তমান তরুণ প্রজন্ম বাংলা ভাষা ব্যবহারে এক ধরনের সংকোচ বোধ করছে এবং ইংরেজি ভাষায় কথোপকথনকে সামাজিক অবস্থান প্রকাশের কৌশল হিসেবে দেখছে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দু-চারটে ইংরেজি শব্দ বলাকে স্বতন্ত্রসত্তা এবং উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা হিসেবে দেখানোর প্রবণতা বাড়ছে, যা ভাষাকে একটি অর্থনৈতিক পণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছে। এই প্রবণতার মূলে রয়েছে বিশ্বায়ন এবং অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। বহু অভিভাবক মনে করেন, অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্য দ্রুত 'ইংরেজি নবিশ' হতে হবে এবং দেশের বাইরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে।

এই মানসিকতা আসলে ঔপনিবেশিক মনস্তাত্ত্বিক উত্তরাধিকারের প্রত্যক্ষ ফল, যেখানে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক সফলতার একটি কৃত্রিম সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। এই ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে, নতুন প্রজন্ম বাংলা ভাষাকে অর্থনৈতিক সফলতার পথে একটি বাধা হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। এর ফলে, মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চার বৈজ্ঞানিক সত্য (মাতৃভাষায় ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ে) গুরুত্ব পাচ্ছে না।

বিশ্বের প্রায় ৩৫ কোটি লোক বাংলায় কথা বললেও, তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলার ব্যবহার এখনও সার্বজনীন নয়। তবে আশার কথা হলো, সরকার ও প্রযুক্তিবিদদের উদ্যোগে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বাংলা ক্রমশ সমৃদ্ধ হচ্ছে। বাংলাদেশ ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের সদস্যপদ লাভ এবং কান্ট্রিকোড টপ লেভেল ডোমেইন 'ডট বাংলা' প্রাপ্তি ইতিবাচক পদক্ষেপ। ১৬৫ কোটি টাকার সরকারি প্রকল্পে বাংলা কার্পাস, বাংলা ওসিআর, স্পিচ টু টেক্সট-সহ বিভিন্ন টুলস তৈরির উদ্যোগ প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের জন্য সহায়ক।

তবে প্রযুক্তির এই প্রসার ভাষার ক্ষেত্রে দ্বিমুখী ফল বয়ে এনেছে—যা প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বনাম নৈতিক দুর্বলতার একটি সুস্পষ্ট চিত্র। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বাংলা লেখার সুযোগ বাড়লেও, প্রমিত ভাষা রীতির অনুশীলন কমেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'যেমন ইচ্ছে তেমন' লেখার এক নতুন রীতি চালু হয়েছে। এর থেকেও ভয়াবহ হলো ভাষার দূষণ ও অশ্লীলতার বিস্তার। বর্তমানে ভাষাদূষণ বায়ুদূষণের মতো দিন দিন বাড়ছে, যেখানে অশ্লীল, নোংরা এবং কুরুচিপূর্ণ শব্দ ও গালাগালের ব্যবহার নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ইউটিউব ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই কুরুচিপূর্ণ কনটেন্টের জনপ্রিয়তা প্রায়শই ঈর্ষণীয়, যা ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ। এফএম রেডিওতেও বাংলা ভাষার ঐতিহ্য হারিয়ে 'জগাখিচুড়ি'র মতো অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন' প্রণয়ন করা হলেও, সব স্তরে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বানানরীতি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুসরণ করা হচ্ছে না, ফলে বানানে সমতা আসছে না। উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং পেশাগত ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত না হওয়ার কারণে নতুন প্রজন্ম মনে করে বাংলা ভাষা কেবল দৈনন্দিন জীবনে কাজে আসে, কিন্তু উচ্চতর জ্ঞানার্জনে এর কোনো ভূমিকা নেই। আইন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অন্যান্য উচ্চতর বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরিভাষা তৈরি না হওয়ায় সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। যদি মাতৃভাষা উচ্চতর জ্ঞান ও প্রযুক্তির বাহন হতে না পারে, তবে নতুন প্রজন্ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদেশি ভাষার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হবে, যা ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে আরও শক্তিশালী করে।

মাতৃভাষার সুরক্ষা কেবল তার ব্যাকরণের শুদ্ধতা রক্ষা করা নয়; এটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পরিচয় এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক। এই প্রেক্ষাপটে, সংবাদ, সাহিত্য ও সচেতনতার সম্মিলিত প্রয়াস অপরিহার্য।

- সাহিত্য: এটি মানবিকতার ভিত্তি ও শিকড়ের সন্ধান দেয়। সাহিত্য চর্চা নতুন প্রজন্মের জন্য এক জাতীয় প্রতিরক্ষা কৌশল হিসেবে কাজ করে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বাণিজ্যিকভাবে বিবেচনা না করে মূল কোর্স হিসেবে পড়ানো নৈতিক দায়িত্ব।
- সংবাদ (গণমাধ্যম): গণমাধ্যম সমাজের দর্পণ এবং শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। নিয়মিত সংবাদ পাঠের অভ্যাস তরুণদের তথ্য মূল্যায়ন ও যুক্তি বিশ্লেষণের সক্ষমতা তৈরি করে এবং তাদের দেশ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। তবে এর জন্য সাংবাদিকদের অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে হবে।
- সচেতনতা: এই সচেতনতাই নাগরিককে ভাষার মর্যাদা রক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি দায়বদ্ধতা পালনে উদ্বুদ্ধ করে। যখন সাহিত্য মানবিক আদর্শ স্থাপন করে এবং সংবাদমাধ্যম বস্তুনিষ্ঠভাবে সেই আদর্শের বিচ্যুতি তুলে ধরে, তখনই সচেতন নাগরিক সমাজ তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়।

এছাড়াও, পরিবারের ভূমিকা মৌলিক। পারিবারিক সচেতনতাই মাতৃভাষার বিকৃতি রোধের মূল চাবিকাঠি। অভিভাবককে অবশ্যই ভুল ইংরেজি বলতে পারাকে গর্ব না করে, শুদ্ধ বাংলা বলাকেই যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

বাংলা ভাষার অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষায় কেবল আবেগনির্ভরতা নয়, বরং সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি:

১. আইন ও নীতিমালার বাস্তবায়ন: 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন' কার্যকর করা এবং দ্রুত একটি জাতীয় ভাষানীতি প্রণয়ন করা।

২. জ্ঞানচর্চা ও পরিভাষার উন্নয়ন: আইন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-সহ উচ্চতর বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় পরিভাষা তৈরি এবং বিশ্ব সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সেরা কাজগুলো বাংলায় অনুবাদের ওপর জোর দেওয়া।

৩. শিক্ষার রূপান্তর: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষার গুরুত্ব নিশ্চিত করা এবং ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে বাংলা পড়ানো বাধ্যতামূলক করা।

৪. ঔপনিবেশিক মানসিকতা পরিহার: ইংরেজি বলা বা লিখতে পারাকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক মনে করার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসা।

বাংলা ভাষা কেবল একটি যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি বাঙালির আত্মপরিচয়, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং হাজার বছরের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। মাতৃভাষার সংরক্ষণের দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রের নয়, সমাজের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের। সাহিত্য দেবে নৈতিক ভিত্তি, সংবাদ দেবে বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা, আর সচেতনতা দেবে তা প্রয়োগের দায়িত্ববোধ। এই নিরন্তর সংগ্রামই আমাদের জাতীয় দায়বদ্ধতা, যা আগামী প্রজন্মকে আত্মবিশ্বাসী, নিষ্ঠাবান এবং মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলবে।

ল্যুভর লুণ্ঠন ২০২৫

- রুদ্রপ্রসাদ দে

প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়াম, যা বিশ্বের সর্বাধিক পরিদর্শিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং ফরাসি জাতীয় গৌরবের প্রতীকস্বরূপ, একসময় তার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রায় অভেদ্য বলে মনে করা হতো। ফরাসি রাজকীয় গয়না সহ পৃথিবীর অন্যতম মূল্যবান শিল্পকর্মগুলির সংরক্ষক এই প্রতিষ্ঠানটি, ১৯২৫ সালের ১৯ অক্টোবর রবিবার এক দুঃসাহসিক ডাকাতির শিকার হয়। দিনের আলোয়, সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে ৯টা ৪০ মিনিটের মধ্যে সংঘটিত এই হাইস্ট ফ্রান্সের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। এই ঘটনা ফরাসি নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর গুরুতর প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে এক গভীর 'আত্মপরিচয়ের সঙ্কট' সৃষ্টি করেছে।

চোরেরা প্রায় €৮৮ মিলিয়ন (১০২ মিলিয়ন ডলার) মূল্যের আটটি মহামূল্যবান নেপোলিয়নিক অলঙ্কার চুরি করে। এই মূল্য কেবল আর্থিক নয়; এর সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিক ও প্রতীকী মূল্য অপূরণীয়। বিশ্বের সবচেয়ে সুরক্ষিত বলে পরিচিত একটি প্রতিষ্ঠান, যা 'মোনা লিসা'র সুরক্ষার জন্য খ্যাতিমান, তার কাঠামোর মধ্যে এমন একটি 'অবিশ্বাস্য ফাঁক' (unbelievable gap) তৈরি হওয়ায় তা বিশ্বজুড়ে অন্যান্য জাদুঘরের জন্য এক গভীর সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করেছে।

এই ডাকাতি কেবল একটি চুরি নয়, এটি ফরাসি সরকারের সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষমতা এবং বিশ্বব্যাপী শিল্প-নিরাপত্তা প্রোটোকলের জন্য একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ। তদন্তে নিয়োজিত বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট BRB (Brigade de Répression du Banditisme) মনে করে, এটি চারজনের একটি অত্যন্ত অভিজ্ঞ দলের কাজ ছিল, যারা সম্ভবত নির্মাণ কর্মীদের বেশে (হলুদ হাই-ভিস জ্যাকেট পরিধান করে) তাদের গতিবিধিকে কম সন্দেহজনক করে তোলে।

চুরির পদ্ধতি ছিল আধুনিক প্রযুক্তি এবং নিম্ন-প্রযুক্তিগত সরঞ্জামগুলির এক সমন্বিত কৌশল:

- প্রবেশ পথ: সন্দেহভাজনরা একটি গাড়িতে লাগানো যান্ত্রিক লিফট বা ফার্নিচার হোস্ট (Basket Lift/Furniture Hoist) নিয়ে আসে। এর সাহায্যে তারা সেন নদীর পাশের একটি বারান্দা দিয়ে গ্যালারি দা'পোলোন (Gallery of Apollo)-এর প্রথম তলার জানালার কাছে পৌঁছায়।
- অনুপ্রবেশ কৌশল: জানালা পর্যন্ত পৌঁছানোর পর, চোরেরা শক্তিশালী বৈদ্যুতিক যন্ত্র, যেমন অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার বা পাওয়ার টুলস ব্যবহার করে, জানালাটি কেটে ভেতরে প্রবেশ করে।
- দ্রুত পলায়ন: জাদুঘরের ভেতরে প্রবেশের পর, চোরেরা দুটি প্রদর্শনী কেসের কাচ কেটে গয়নাগুলি নিয়ে যায়। ফরাসি পুলিশ জানায়, চোরেরা ভেতরে মাত্র চার মিনিটের জন্য ছিল এবং অপেক্ষমাণ দুটি স্কুটারে চড়ে প্যারিসের ভিড়ের ট্র্যাফিকের সুযোগ নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

মাত্র ৪ মিনিটের এই দ্রুততা ইঙ্গিত করে যে ল্যুভরের রেপিড-রেসপন্স ইউনিট (Rapid-Response Unit) কার্যকরভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। যদিও জাদুঘরের পরিচালক লরেন্স দে কারস নিশ্চিত করেছেন যে অ্যালার্মগুলি কার্যকরভাবে কাজ করেছিল, তবুও প্রহরীদের ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর সময় (Response Time) এর গুরুতর অসামঞ্জস্য চোরদের সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল।

চুরি যাওয়া আটটি ঐতিহাসিক সামগ্রী ফরাসি রাজকীয় ইতিহাসের অত্যন্ত মূল্যবান অংশ এবং নেপোলিয়নিক আমলের ঐতিহ্য বহন করে। অপহৃত সামগ্রীর তালিকায় ছিল:

ঐতিহাসিক সম্পর্ক	অপহৃত সামগ্রীর ধরণ	মূল্যবান উপাদান	বিশেষ মন্তব্য
নেপোলিয়ন I ও মারি-লুইস	একটি নেকলেস ও কানের দুল	হীরা	ঐতিহাসিক রাজকীয় সেট।
সম্রাজ্ঞী ইউজেনি	ডায়েডেম, ব্রোচ, আলংকারিক বো	প্রায় ২,০০০ হীরা	ডায়েডেমটি পালানোর সময় ফেলে যাওয়ায় পুনরুদ্ধার হয়।

মারি-অ্যামেলি	একটি তিয়ারা, নেকলেস, কানের দুল	নীলকান্তমণি ও হীরা	নেকলেসটি ৬৩১টি হীরা সমন্বিত ছিল।

চুরি যাওয়া রত্নালঙ্কারগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। শিল্প অপরাধ বিশেষজ্ঞ ক্রিস্টোফার মারিনেলো সতর্ক করেছেন যে এই ঐতিহাসিক গয়নাগুলিকে ভেঙে ফেলা বা গলিয়ে ফেলার কৌশলটি শিল্প চোরাচালান জগতে একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। চোরেরা রত্নগুলি গলিয়ে বা ভেঙে ছোট ছোট পাথর হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করতে পারে, যাতে তাদের ঐতিহাসিক পরিচয় মুছে যায় এবং ট্র্যাক করা কঠিন হয়। দ্রুত উদ্ধার করা না গেলে, এই ঐতিহাসিক অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার ঝুঁকি বাড়বে।

ল্যুভরের পরিচালক লরেন্স দে কারস এই ঘটনাকে "ভয়াবহ ব্যর্থতা" ('terrible failure') বলে স্বীকার করেন এবং পদত্যাগের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। সংস্কৃতি মন্ত্রী রাচিদা দাতি প্রথমে অস্বীকার করলেও, পরে তিনিও স্বীকার করেন যে নিরাপত্তা ব্যর্থ হওয়ায় ফ্রান্সের একটি 'ভয়াবহ চিত্র' বিশ্বে উঠে এসেছে। এই ডাকাতির সাফল্যের কারণ হিসেবে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটি এবং ভুল ঝুঁকি বিশ্লেষণকে চিহ্নিত করা যায়:

১. সিসিটিভি ব্লাইন্ড স্পট: পরিচালক স্বীকার করেছেন যে বাইরের দিকের দেওয়ালগুলিতে ক্যামেরা কভারেজ অত্যন্ত অপ্রতুল ছিল এবং কিছু ক্যামেরা 'পুরোনো' (ageing) হয়ে গিয়েছিল। গ্যালারি দা'পোলোন-এর প্রতি তিনটি কক্ষের মধ্যে একটি কক্ষে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল না।

২. প্রদর্শন কেসের দুর্বলতা: ডিসপ্লে কেসগুলি মূলত গুলির আঘাত (Gunshots) প্রতিরোধের জন্য তৈরি ছিল, কিন্তু অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডারের মতো উচ্চ-শক্তির যান্ত্রিক অনুপ্রবেশের জন্য সেগুলির সুরক্ষা যথেষ্ট ছিল না।

ঐতিহাসিক ১৯১১ সালের মোনা লিসা চুরির পর নিরাপত্তা প্রোটোকলগুলি পরিবর্তিত হলেও, তা ২০২৫ সালের আধুনিক, সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্রের বিরুদ্ধে কার্যকর ছিল না। ১৯১১ সালের ঘটনা ছিল অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার উদাহরণ, আর ২০২৫ সালের চুরি ছিল বহিরাগত, প্রযুক্তিনির্ভর এবং সুপরিকল্পিত।

ডাকাতির পরপরই, ল্যুভর কর্তৃপক্ষ অবশিষ্ট রাজকীয় গয়নাগুলি প্যারিসের ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সের অতি-সুরক্ষিত ভূগর্ভস্থ ভল্ট 'সুতেরেইন' (Souterraine)-এ স্থানান্তরিত করে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ল্যুভর প্রকারান্তরে স্বীকার করে যে একটি ঐতিহাসিক জাদুঘরের বিশাল কাঠামো আধুনিক আক্রমণ থেকে জাতীয় সম্পদ রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। এটি কিউরেটরিয়াল দক্ষতা এবং সামরিক-আর্থিক-স্তরের সুরক্ষার অবকাঠামোকে একত্রিত করে সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের জন্য একটি উদ্ভাবনী মডেল তৈরি করছে।

ল্যুভর জাদুঘরের ২০২৫ সালের ডাকাতি ফরাসি জাতির জন্য একটি গভীর আঘাত। এই ঘটনা বিশ্বকে মনে করিয়ে দেয় যে কোনো প্রতিষ্ঠানই পেশাদার, সংঘবদ্ধ অপরাধীদের হাত থেকে নিরাপদ নয়। এই চুরির সাফল্য ছিল পুরাতন নিরাপত্তা অবকাঠামো, অপ্রতুল নজরদারি এবং ভুল ঝুঁকি বিশ্লেষণের ফল।

অপরাধ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই হাইস্টটি সম্ভবত বৈশ্বিক মিউজিয়াম সিকিউরিটি প্রোটোকলগুলি "পুনর্লিখন" করবে। ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অবশ্যই বহিরাগত, যান্ত্রিক এবং দ্রুত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য আইওটি (IoT) এবং অ্যাকটিভ আরএফআইডি (Active RFID) সিস্টেমের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। তবে চুরি যাওয়া ঐতিহাসিক রত্নগুলির অক্ষত অবস্থায় পুনরুদ্ধার করাই এখন তদন্তকারী BRB ইউনিটের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

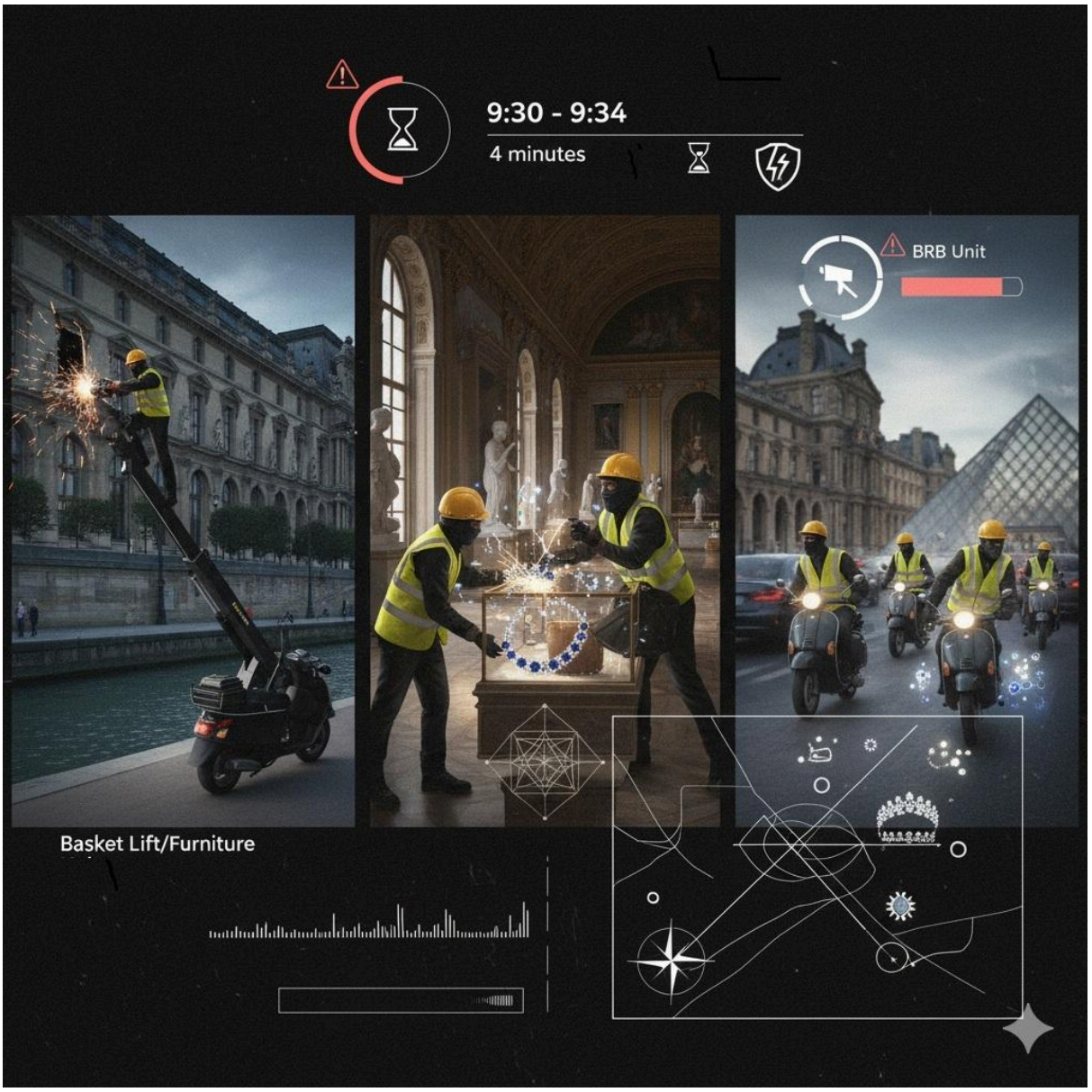
9:30 - 9:34
4 minutes
BRB Unit
Basket Lift/Furniture

জলচিহ্ন

- অকিঞ্চন মন্ডল

বাঁওড়টার নাম হালদিবাঁওড়। চারদিক জলে ঘেরা, মাঝখানে কয়েকটা ছোট ঢিবি, গাছগাছালি, আর জলজ আগাছায় ঢাকা এক অনন্ত নীরবতা। পাখির ডাকে সকাল গাঢ় হয়, তারপর দুপুরের রোদে জলের উপর সোনালি রেশ ছড়িয়ে পড়ে— যেন প্রকৃতি নিজের আয়নায় নিজের মুখ দেখছে।

এই বাঁওড়েই থাকত হরিপদ মাঝি। বয়স পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই, মুখে ধূসর দাড়ি, গায়ের রং পুড়ে কালচে। তার নৌকো— "মা গঙ্গা"— তার প্রাণ। সেই নৌকো নিয়েই হরি প্রতিদিন ভোরের কুয়াশা ফুঁড়ে বেরিয়ে যেত জাল ফেলার আশায়। নদী শুকিয়ে গিয়েছে বছর দশেক আগে, কিন্তু বাঁওড়টা টিকে আছে নদীর স্মৃতি হয়ে— যেন জলচিহ্ন, সময়ের শরীরে লেগে থাকা এক প্রমাণ।

"এই বাঁওড়ই আমার মা," হরি মাঝেমাঝে বলত।
তার স্ত্রী ফুলেশ্বরী বছর পাঁচেক আগে মারা গেছে জ্বরে। একমাত্র ছেলে, রবি, এখন শহরে— হাওড়া স্টেশনের পাশে এক মাছের গোডাউনে কাজ করে। হরিপদর একাকিত্ব কেবল বাঁওড়ের জলের মধ্যেই যেন শান্তি খুঁজে পেত।

প্রতিদিন সকালে হরি গামছা কাঁধে ফেলে, হাতে নৌকার দাঁড় টেনে বেরিয়ে পড়ত। কুয়াশার মধ্যে দাঁড়ের আওয়াজে বাঁওড়টা যেন সাড়া দিত— "ধপ, ধপ"— মৃদু প্রতিধ্বনি।
মাছের জাল ফেলে অপেক্ষা করত ঘন্টার পর ঘন্টা। মাঝেমাঝে বকের ডাক, দূরে পেঁচা, কিংবা বাতাসে ভেসে আসা নলখাগড়ার সোঁদা গন্ধ— এই ছিল তার সংসার।

কিন্তু গত বছর থেকে বাঁওড়ের জল কমে আসছে। শীতে যখন চাষিরা পাম্প বসিয়ে জল তুলে নেয় ধানক্ষেতে, তখন হরির জালে ধরা পড়ে কেবল কাদা, আর শেওলা। মাছগুলো নেমে গেছে তলদেশে— হয়তো আর ফিরে আসবে না।

একদিন সকালে গ্রামের লোকজন হরির নৌকা দেখতে পায় বাঁওড়ের ধারে, কিন্তু মানুষটা নেই।
নৌকোর ভেতরে তার জাল ছড়ানো, একটা পিতলের গ্লাস, আর ফুলেশ্বরীর পুরোনো আলতা-রাঙা থালা পড়ে আছে।
"বুড়োটারে হয়তো কুমিরে টান মেরেছে," কেউ বলে।
"না রে, বাঁওড়ে কুমির কই এখন!" — আরেকজন বলে ওঠে।

তিন দিন ধরে তল্লাশি চলে। বাঁওড়ের চারদিকে বাঁশের খুঁটি পুঁতে জাল টেনে ঘুরে দেখা হয়, কিন্তু কোনো দেহ পাওয়া যায় না। শুধু পাড়ের কাদা থেকে পাওয়া যায় একটা ভাঙা দাঁড়, আর তার কুটিরের পাশে শুকনো পত্রে ঢাকা একখানা পুরোনো খাতা।

খাতার পাতায় বড় অক্ষরে লেখা—
"জল আমার রক্ত। আমি হারাব না।"

এরপর কয়েকদিন গ্রামের আকাশ ভারী হয়ে থাকে। জলের উপর ধূসর মেঘ নেমে আসে, বাতাসে গন্ধ— বৃষ্টির আগে চেনা এক সোঁদা ভাব।
চতুর্থ রাতে বাঁওড়ের উপর ঝড় ওঠে। বাতাস এমনভাবে বাঁশের ঝোপে লাগে যে মনে হয় কারও কান্না ভেসে আসছে। বজ্রপাতের আলোয় বাঁওড়টা মুহূর্তে দাউদাউ করে ওঠে— আবার অন্ধকার।

পরদিন সকালে গ্রামের কয়েকজন মৎস্যজীবী দেখতে পায়, হরির নৌকো "মা গঙ্গা" আবার বাঁওড়ের মাঝখানে ভেসে আছে। কিন্তু এবার নৌকার তলায় অদ্ভুত সব দাগ— যেন কাদার নিচ থেকে কেউ নৌকোর পেট ঘষে ঘষে উঠেছে। আর জালের ভেতরে— ছোট ছোট মাছ, চকচকে আঁশে ভরা— যেন কোনো অলৌকিক স্পর্শে ফিরে এসেছে জীবন।

লোকজন বলে, "হরিপদ বেঁচে আছে! বাঁওড় তাকে নেয়নি।"
কেউ আবার বলে, "ওর আত্মা এখন এই জলে।"

এক সপ্তাহ পর রবি ফিরে আসে শহর থেকে। বাবার খবর শুনে বুক ভারী হয়ে গেছে। কুটিরে ঢুকে দেখে, মাটির দেওয়ালে এখনো বাবার হাতের দাগ— দেওয়ালে ঝোলানো শুকনো জাল, কপালে তিলক আঁকা মাছের খোলস।
বাঁওড়ের দিকে তাকিয়ে রবি ভাবে— "বাবা যদি ফিরে আসতেন, একবার!"

রাত্তিরে, সে বাঁওড়ের ধারে গিয়ে বসে। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু দূরে কোথাও ব্যাঙ ডাকে।
হঠাৎ জলের মধ্যে থেকে একটা ছোট দাঁড় ভেসে আসে— ঠিক হরিপদর পুরোনো নৌকার দাঁড়। রবি সেটা তুলে নেয়।
তার মনে হয়— যেন বাবার হাত এখনো সেই দাঁড়ে ধরা আছে, উষ্ণ, ক্লান্ত, কিন্তু জীবন্ত।

সেই রাতে সে খাতাটা আবার খোলে। শেষ পাতায় বাবার হাতের লেখা—

"জল আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দেবে।

আমি থাকব জলে, ও থাকুক তীরে—
দু'জনেই বাঁচব, একে অপরের মধ্যে।"

পরদিন সকাল থেকে রবি বাঁওড়ের কাজ নেয় নিজের হাতে। সে আবার জাল ফেলে, বাঁওড়ের জল পরীক্ষা করে, তলদেশের আগাছা কেটে পরিষ্কার করে।
গ্রামের ছেলেদের বলে, "জল যদি না থাকে, আমাদেরও জীবন থাকবে না।"
তার বাবার মতোই সে নৌকো নাম দেয়— "নবজল"।

কয়েক মাস পর বাঁওড় আবার ভরে ওঠে। জলজ ফুলে ফুটে ওঠে পাড়ের নলখাগড়া, আকাশে ফিরে আসে বক আর পানকৌড়ি।
রবির জালে এখন আবার বড় বড় চিংড়ি, কাতলা, রুই ধরা পড়ে।
আর বাঁওড়ের জলে ভাসে এক মৃদু প্রতিফলন— যেন হরিপদ মাঝি এখনো সেখানে দাঁড়িয়ে, কাঁধে গামছা, মুখে হাসি, তাকিয়ে আছে জলের দিকে।

রবি মাঝে মাঝে ভোরে দাঁড় টেনে নৌকা চালায়। হালকা কুয়াশায় জলের উপর সূর্য ওঠে।
হঠাৎ তার মনে হয়, কেউ পেছন থেকে বলছে— "দাঁড়টা ঠিক করে ধরো, বাপ।"
সে ঘুরে তাকায়— কেউ নেই।
তবু জলের উপর একজোড়া ঢেউ উঠে এসে নৌকোর পাশে গা ছুঁয়ে যায়— যেন জলের ভিতর থেকে কেউ আশীর্বাদ করে ছুঁয়ে দিচ্ছে।

সেই ঢেউয়ের রেখা, সেই জলচিহ্ন— হয়তো এক পিতার ভালোবাসা, হয়তো এক জীবনের পরম স্বাক্ষর।

বাঁওড় এখন শান্ত। বাতাসে ঝিরঝির শব্দ, পাড়ে শিশির ঝলমল করে।
আর রবি মনে মনে বলে—
"বাবা, তুমি আছো, এই জলের ভিতরেই আছো। জল মানে জীবন, তুমি সেই জীবন।"

হালদিবাঁওড়ের গল্প আজও গ্রামের লোকেরা বলে—
যখনই কেউ জলে নামার আগে পা ছোঁয়ায়, তখন জল একটু দুলে ওঠে।
লোকজন বলে, "হরিপদ মাঝি আশীর্বাদ করছেন।"

বাঁওড়টা এখন সংরক্ষিত। সরকার এটাকে "স্থানীয় জীববৈচিত্র্য কেন্দ্র" ঘোষণা করেছে।
পাড়ে একটা ছোট পাথরের ফলক— তাতে খোদাই করা আছে কয়েকটি শব্দ, যা হরিপদ মাঝির খাতায় পাওয়া গিয়েছিল—

"জল আমার রক্ত। আমি হারাব না।"

বুরেভেস্টনিক পারমাণবিক ক্রুজ - অক্টোবর ২০২৫

- অনিন্দিতা পাল

২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে রাশিয়া তার অত্যন্ত গোপনীয় ও বিতর্কিত পারমাণবিক শক্তিচালিত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ৯এম৭৩০ 'বুরেভেস্টনিক' (Burevestnik)-এর 'নির্ণায়ক পরীক্ষা' সফলভাবে সম্পন্ন করার ঘোষণা দিয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ২৬ অক্টোবর, রবিবার এই সাফল্যের কথা ঘোষণা করেন। সামরিক বাহিনীর চিফ অফ জেনারেল স্টাফ, জেনারেল ভ্যালেরি গেরাসিমভ, নিশ্চিত করেন যে ২১ অক্টোবর তারিখে সম্পন্ন হওয়া এই পরীক্ষায় ক্ষেপণাস্ত্রটি প্রায় ১৫ ঘন্টা ধরে ১৪,০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে। এই ঘটনাটি ইউক্রেন যুদ্ধের তীব্রতার মধ্যে এবং ২০২৬ সালের শুরুতে নিউ স্টার্ট (New START) চুক্তির মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার আশঙ্কার প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক কৌশলগত ভারসাম্যে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

বুরেভেস্টনিক—ন্যাটো কর্তৃক যেটি এসএস-সি-এক্স-৯ স্কাইফল (SSC-X- Skyfall) নামে পরিচিত—এমন একটি অস্ত্র যা তার নিজস্ব প্রযুক্তির কারণে প্রচলিত ক্ষেপণাস্ত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর মূল উদ্ভাবন হলো এর পারমাণবিক প্রপালশন সিস্টেম। একটি মিনিএচার পারমাণবিক রিঅ্যাকটর ব্যবহার করার কারণে এটি প্রচলিত রাসায়নিক জ্বালানির সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত, যা একে কার্যত সীমাহীন পাল্লা দিয়েছে।

বহু বছর ধরে এটি একটি 'অবিশ্বাস্য' বা প্রযুক্তিগতভাবে চরম চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত ছিল। ১৩টি জানা পরীক্ষার মধ্যে ১১টি ব্যর্থ হওয়ার রেকর্ড ছিল। কিন্তু একটি সফল ১৫ ঘন্টার উড়ানের দাবি, যা পূর্বের ব্যর্থতাগুলির তুলনায় একটি বিশাল প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, পশ্চিমকে এর ঝুঁকি সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। এই ক্ষেপণাস্ত্রটি ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৫০ মিটার উপরে উড়তে পারে এবং এর উড়ানপথ এতই অননুমেয় যে এটি বর্তমান স্থল-ভিত্তিক বা সমুদ্র-ভিত্তিক প্রতিরক্ষা রাডারকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে সক্ষম বলে মস্কো দাবি করেছে।

জেনারেল গেরাসিমভের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পরীক্ষা চলাকালীন ক্ষেপণাস্ত্রটি উল্লম্ব এবং অনুভূমিক উভয় ধরনের কৌশল (manoeuvring) প্রদর্শন করেছে। তিনি নিশ্চিত করেন, এই উড়ানটি ক্ষেপণাস্ত্রটির "সীমা পর্যন্ত" পরীক্ষা ছিল না, যার অর্থ এটি ভবিষ্যতে আরও দীর্ঘ উড়ান দিতে সক্ষম। সামরিক কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে বুরেভেস্টনিকের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করে যে এটি "যেকোনো দূরত্বে অবস্থিত অত্যন্ত সুরক্ষিত লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে নিশ্চিত নির্ভুলতার সাথে" ব্যবহার করা যেতে পারে।

বৈশিষ্ট্য	৯এম৭৩০ বুরেভেস্টনিক (পারমাণবিক শক্তিচালিত)	ঐতিহ্যবাহী দূর-পাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র
পাল্লা (Range)	সীমাহীন (কার্যত)	সীমিত (সাধারণত ২,৫০০ কিমি-এর কম)
চালক শক্তি	মিনিএচার পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর	টার্বোজেট/টার্বোফ্যান (রাসায়নিক জ্বালানি)
উড়ানপথ	অননুমেয়, নিম্ন উচ্চতা (৫০ মি.)	তুলনামূলকভাবে নির্ধারিত

বুরেভেস্টনিকের প্রযুক্তিগত সাফল্য সত্ত্বেও এর পারমাণবিক শক্তিচালিত প্রকৃতি গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করেছে। পশ্চিমা সামরিক বিশ্লেষকেরা এই ক্ষেপণাস্ত্রটিকে "উড়ন্ত চেরনোবিল" (Flying Chernobyl) বলে অভিহিত করেছেন। ধারণা করা হয়, ক্ষেপণাস্ত্রটি একটি ওপেন-লুপ সিস্টেম ব্যবহার করে, যেখানে বাতাস রিঅ্যাকটর কোর-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উত্তপ্ত হয় এবং প্রপালশন তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায়, কিছু তেজস্ক্রিয় কণা বায়ুমণ্ডলে নিঃসৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এই প্রযুক্তির ঝুঁকি ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে স্পষ্ট হয়, যখন আর্কটিকের নিয়োনোকসা নৌবাহিনীর পরীক্ষা কেন্দ্রে একটি ব্যর্থ পরীক্ষা এবং তার পুনরুদ্ধারের সময় বিস্ফোরণ ঘটে। এটি একটি মারাত্মক তেজস্ক্রিয় দুর্ঘটনার জন্ম দেয়, যার ফলে ৫ জন সামরিক ও বেসামরিক বিশেষজ্ঞ নিহত হন। নিয়োনোকসা দুর্ঘটনা দেখিয়েছিল যে এই অস্ত্রের মোতায়েন বা এমনকি পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াও অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং পরিবেশগত দূষণ ঘটাতে পারে।

বুরেভেস্টনিক পরীক্ষার ঘোষণাটি অত্যন্ত কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দেওয়া হয়েছে। মস্কো এর মাধ্যমে সতর্ক করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো জোট যদি ইউক্রেনকে দীর্ঘ-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করে রাশিয়ার অভ্যন্তরে আঘাত হানার অনুমতি দেয়, তবে মস্কো তাদের সর্বাধুনিক এবং 'অজেয়' কৌশলগত অস্ত্র মোতায়েন করতে দ্বিধা করবে না।

এছাড়াও, প্রেসিডেন্ট পুতিনের সামরিক নেতাদের সাথে বৈঠকে এই অস্ত্রের 'শ্রেণীবিভাগ' নির্ধারণের নির্দেশ দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত পদক্ষেপ। যেহেতু বুরেভেস্টনিক একটি গ্রাউন্ড-লঞ্চড ক্রুজ মিসাইল, এটি বর্তমানে নিউ স্টার্ট চুক্তির মতো কৌশলগত অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা এবং সীমাবদ্ধতার বাইরে থাকে। এই অ-নিয়ন্ত্রিত সক্ষমতা রাশিয়ার জন্য একটি শক্তিশালী কৌশলগত সুবিধা, যা নিউ স্টার্ট চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো বা ভবিষ্যতে একটি নতুন চুক্তি আলোচনার সময় মস্কোর দর কষাকষির ক্ষমতা বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। এই অস্ত্র এখন কেবল একটি প্রচারমূলক বিজয় নয়, এটি রাশিয়ার সামরিক সক্ষমতা তুলে ধরে এবং ইউক্রেন সংঘাতকে কৌশলগত পারমাণবিক প্রতিরোধের ছাতার নিচে নিয়ে আসে।

পুতিন এই সফল পরীক্ষাটিকে রাশিয়ার পারমাণবিক ঢালের "আধুনিকতা" সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন এবং দ্রুততম সময়ে এই অস্ত্রটিকে রুশ সশস্ত্র বাহিনীতে মোতায়েন করার জন্য প্রয়োজনীয় "পরিকাঠামো প্রস্তুত করার" নির্দেশ দিয়েছেন।

৯এম৭৩০ বুরেভেস্টনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের অক্টোবর ২০২৫ সালের সফল নির্ণায়ক পরীক্ষা রাশিয়ার সামরিক সক্ষমতার জন্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এটি তার প্রায় সীমাহীন পাল্লা এবং অননুমেয় উড়ানপথের মাধ্যমে পশ্চিমা ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অপ্রাসঙ্গিক করার হুমকি দেয়।

বুরেভেস্টনিকের সফল পরীক্ষা এবং মোতায়েনের নির্দেশ বৈশ্বিক কৌশলগত বিশ্লেষক এবং নীতি নির্ধারকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে:

১. নতুন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর উন্নয়ন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ন্যাটো মিত্রদের উচিত দ্রুত এমন একটি নতুন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর দিকে মনোযোগ দেওয়া, যা বুরেভেস্টনিকের মতো পারমাণবিক চালক শক্তিসম্পন্ন এবং অননুমেয় গতিপথের কৌশলগত অস্ত্রগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

২. পরিবেশগত সুরক্ষা প্রোটোকল নিশ্চিতকরণ: আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA) এবং পরিবেশবাদী প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে রাশিয়াকে এই অস্ত্রের মোতায়েন সংক্রান্ত কঠোর পরিবেশগত সুরক্ষা প্রোটোকল প্রকাশ করার জন্য চাপ দেওয়া উচিত।

৩. প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি: ন্যাটো জোটকে অবশ্যই তাদের ক্ষেপণাস্ত্র সনাক্তকরণ এবং ইন্টারসেপশন সক্ষমতা বাড়াতে হবে, বিশেষত নিম্ন-উচ্চতা এবং স্টিলথ প্রযুক্তির ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে।

এই অস্ত্র পারমাণবিক অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, যা বৈশ্বিক ডিটারেন্স স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য।

БУРЕВЕСТНИК

মাটির হাঁড়ির ঘ্রাণ

- মহঃ ইরফান

মাটির হাঁড়িতে রান্না করা কেবল একটি রন্ধনপ্রণালী নয়; এটি গ্রামীণ সরলতা, প্রাকৃতিক জীবনযাত্রা এবং ঐতিহ্যের প্রতি গভীর দার্শনিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি। একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক রান্নাঘরে যখন কৃত্রিম উপাদান প্রাধান্য পাচ্ছে, তখন মাটির পাত্রের প্রত্যাবর্তন স্বাস্থ্য সচেতনতা, নস্টালজিয়া এবং পরিবেশগত উদ্বেগের একটি সচেতন সাংস্কৃতিক নির্বাচনকে নির্দেশ করে। এই প্রতিবেদনটি মাটির হাঁড়িতে রান্নার ঐতিহাসিক শিকড়, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং আধুনিক রান্নাঘরে এর সফল অভিযোজনের কৌশলগুলি বিশ্লেষণ করে।

প্রাচীন ভারতীয় রান্না মূলত উনুন বা কাঠকয়লার মৃদু আঁচে ধীরগতিতে (Slow Cooking) পরিচালিত হতো, যেখানে মাটির পাত্র ছিল অপরিহার্য। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণগুলি ইঙ্গিত করে যে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা থেকেই 'মটকা' (Matkas) এবং 'হাঁড়ি' (Handis) ভারতীয় রান্নাঘরের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। বাংলায় মৃৎশিল্পের বিকাশ খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে ঘটেছিল। এই পাত্রগুলি কেবল রান্নার সরঞ্জাম ছিল না, বরং তা সামাজিক জমায়েত এবং উৎসবগুলিতে খাবার তৈরির জন্য ব্যবহৃত হতো।

মাটির পাত্রের এই পুনরুজ্জীবনের নেপথ্যে প্রধানত তিনটি কারণ কাজ করছে:

- স্বাস্থ্যগত সুবিধা: মাটির পাত্রে রান্না করা খাবার সহজপাচ্য এবং পুষ্টিগুণ বজায় রাখে।
- খাদ্য নিরাপত্তা: ননস্টিক কুকওয়্যারের ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ থেকে দূরে থাকা।
- পরিবেশগত কারণ: মাটির পাত্র দামে কম এবং পরিবেশবান্ধব।

এই শিল্পটি ঐতিহ্যগতভাবে কুম্ভকার (কুম্ভকারা) নামে পরিচিত মৃৎশিল্পী সম্প্রদায় দ্বারা চর্চিত হয়, যা গ্রামীণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

মাটির পাত্রের পুনরুজ্জীবনের মূলে রয়েছে এর বৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্যগত সুবিধা, যা আধুনিক কুকওয়্যারের তুলনায় এটিকে সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে।

মাটির পাত্রগুলি কাদামাটি দিয়ে তৈরি, যা একটি ছিদ্রযুক্ত (Porous) উপাদান। এই ছিদ্রযুক্ত গঠন তাপ এবং আর্দ্রতাকে সমানভাবে সঞ্চালিত হতে সাহায্য করে। ধাতব পাত্রের মতো তীব্র তাপের আঘাত না দিয়ে, মাটির পাত্র ধীরে ধীরে তাপ গ্রহণ করে এবং সমানভাবে খাবারের সমস্ত অংশে ছড়িয়ে দেয়। এর ফলে খাবার তার নিজস্ব রসে সেদ্ধ হতে পারে, যা স্বাদকে আরও গভীর করে তোলে।

মাটির পাত্রে ধীর রান্না প্রক্রিয়া (Slow Cooking) অনুসৃত হওয়ায় খাবারের ভেতরের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট এবং ভিটামিনগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে। উচ্চ তাপে রান্না করা আধুনিক পাত্রের তুলনায় এই পদ্ধতি খাবারের পুষ্টির সর্বোচ্চ আহরণ নিশ্চিত করে। বিশেষত, বিরিয়ানি বা লাল মাংসের মতো পদ, যার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে মশলা মিশ্রিত হওয়া প্রয়োজন, মাটির হাঁড়িতে রান্না করলে সেগুলোর স্বাদ ও ফ্লেভার সুন্দরভাবে মিশে যায়।

মাটির পাত্র রান্নার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো এর ক্ষারীয় (Alkaline) প্রকৃতি। রান্নার সময় তাপ প্রয়োগের ফলে মাটির এই ক্ষারীয় উপাদান খাবারের অ্যাসিডের সঙ্গে মৃদু রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। এর ফলস্বরূপ, খাবারের পিএইচ (pH) ভারসাম্য বজায় থাকে এবং খাদ্যের অম্লতা (Acidity) হ্রাস পায়। এই পিএইচ ভারসাম্য বজায় থাকার কারণে খাবার অনেক সহজপাচ্য হয়, যা হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে মাটির হাঁড়িতে রান্না করা হলে খাবারে কিছুটা বাড়তি আয়রন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেশিয়াম যুক্ত হয়। এছাড়াও, মাটির পাত্রের ছিদ্রগুলি খাবারের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং রান্নার সময় জলীয় বাষ্প বের হয়ে যেতে বাধা দেয়। এর ফলে খুব অল্প তেল ব্যবহার করেই খাবার ভালোভাবে সেদ্ধ করা সম্ভব হয়, যা হৃদরোগী বা স্থূলতা কমাতে ইচ্ছুক মানুষের জন্য আদর্শ।

মাটির পাত্র ও আধুনিক কুকওয়্যারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বৈশিষ্ট্য	মাটির পাত্র (Earthenware)	ননস্টিক পাত্র (Non-stick)	ধাতব পাত্র (Metal/Aluminium)

পুষ্টি সংরক্ষণ	অত্যন্ত উচ্চ (মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ও আর্দ্রতা বজায় থাকে)	কম (উচ্চ তাপে নষ্ট হতে পারে)	মাঝারি
pH ভারসাম্য	ক্ষারীয় প্রকৃতির কারণে অম্লতা হ্রাস করে (সহজপাচ্য)	নিরপেক্ষ	অ্যাসিডিক খাদ্যের সাথে বিক্রিয়া ক্ষতিকারক হতে পারে
বিষাক্ত উপাদান	সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক মুক্ত	ক্ষতিকারক রাসায়নিক ও ধোঁয়া নির্গমনের ঝুঁকি থাকে	ধাতব কণা মিশ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

মাটির হাঁড়ির সফল পুনর্জন্ম কেবল স্বাস্থ্যগত সুবিধার ওপর নির্ভর করে না, বরং আধুনিক গ্যাসের চুলায় এটি কীভাবে ব্যবহার করা হবে, সেই ব্যবহারিক কৌশলের ওপরও নির্ভরশীল। সরাসরি তাপের আঘাত (Thermal Shock) এড়াতে উপযুক্ত সিজনিং (Curing) অপরিহার্য।

নতুন মাটির পাত্রকে তাপ সহনশীল করার জন্য এটি সম্পূর্ণভাবে ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা জলে ডুবিয়ে রাখতে হয়। এরপর পাত্রের ছিদ্রগুলি বন্ধ করে এটিকে মসৃণ ও শক্তিশালী করতে ৩/৪ অংশ জলে কাঁচা চাল মিশিয়ে একদম মৃদু আঁচে ঘন মাড় তৈরি করে স্টার্চ কিউরিং করা আবশ্যক।

গ্যাসের চুলায় মাটির পাত্র ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে জরুরি।

- হিট ডিফিউজার: অবশ্যই একটি হিট ডিফিউজার (Heat Diffuser) ব্যবহার করা উচিত। এটি তাপকে সমানভাবে পাত্রের নিচে ছড়িয়ে দিয়ে তাপীয় আঘাতের ঝুঁকি কমায়।
- ধীরে ধীরে তাপ বৃদ্ধি: তাপ সর্বদা একদম কম (LOW) আঁচে শুরু করতে হবে এবং ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। উচ্চ তাপ ব্যবহার করা উচিত নয়।
- ধৈর্যশীলতা: মাটির পাত্র ধীরে ধীরে গরম হয়; তাই রান্নার সময় ধৈর্যশীলতা প্রয়োজন, যা ধীরগতির রান্নার আসল সুবিধা।

মাটির পাত্র পরিষ্কারের জন্য হালকা গরম জল এবং মৃদু স্ক্রাবার ব্যবহার করা উচিত। ছিদ্রযুক্ত প্রকৃতির কারণে সাবান বা কড়া ডিটারজেন্ট এড়িয়ে চলাই উত্তম, যাতে ডিটারজেন্ট পাত্রের ভেতরে প্রবেশ না করে। ব্যবহারের পর সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা জরুরি।

একবিংশ শতাব্দীতে মাটির পাত্রের প্রত্যাবর্তন পরিবেশ সচেতনতা এবং টেকসই জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাপ ধরে রাখার দুর্দান্ত ক্ষমতার কারণে এটিতে রান্না করতে তুলনামূলকভাবে কম শক্তি লাগে, যা কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করে।

রেস্তোরাঁ ও হোম শেফদের ভূমিকা: কলকাতার উচ্চমানের ডাইনিং অভিজ্ঞতাতেও মাটির হাঁড়ির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় (যেমন, ক্লেপট ফেস্টিভাল)। 'হাঁড়ি মাংস', 'হাঁড়ি বিরিয়ানি' এবং 'দম রান্নার' মতো ঐতিহ্যবাহী পদগুলির জন্য শেফরা মাটির পাত্রকে অপরিহার্য বলে মনে করেন। এই ধীর এবং সিল করা প্রক্রিয়ার ফলে মাংসের আঁশ নরম হয় এবং মসলাগুলির গভীর মিশ্রণ ঘটে, যা খাবারের সেই ঐতিহ্যবাহী ধোঁয়াটে ঘ্রাণ তৈরি করে।

অর্থনৈতিক সম্ভাবনা: মাটির পাত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা গ্রামীণ অর্থনীতি এবং কুম্ভকারদের জন্য একটি নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। তবে, আধুনিক চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে মৃৎশিল্পীদের গ্যাসের চুলায় ব্যবহার উপযোগী উচ্চমানের, সিজন করা পাত্র তৈরি এবং তার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের কৌশল ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

মাটির হাঁড়ির প্রত্যাবর্তন কেবল একটি রান্নার সরঞ্জামের ব্যবহার বৃদ্ধি নয়; এটি স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশগত দায়িত্ব এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক সমন্বিত বহিঃপ্রকাশ। এই প্রাচীন পদ্ধতি তার ক্ষারীয় প্রকৃতি দ্বারা পিএইচ ভারসাম্য বজায় রেখে, পুষ্টির সংযোজন ঘটিয়ে এবং কম তেলে রান্না সম্ভব করে আধুনিক নন-স্টিক ও ধাতব কুকওয়্যারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাটির পাত্রের জনপ্রিয়তাকে ধরে রাখতে এর সঠিক ব্যবহার (হিট ডিফিউজার, সিজনিং) সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং কুম্ভকারদের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি। গ্রামীণ মাটির

হাঁড়ির ঘ্রাণে রান্নার এই পুনর্জন্ম ইঙ্গিত করে যে, অনেক সময় প্রাচীন প্রজ্ঞাই আধুনিক সমস্যার সবচেয়ে কার্যকরী সমাধান দিতে পারে।

প্রযুক্তিগত ভবিষ্যৎ উন্মোচন

- সুনির্মল মুখার্জি

বর্তমান বিশ্ব এক অবিচ্ছিন্ন প্রযুক্তিগত তরঙ্গের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, সাইবার নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত প্রযুক্তি একে অপরের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। এই বিশ্লেষণটি এই ক্ষেত্রগুলির বাজার প্রবণতা, নৈতিক প্রভাব এবং একটি টেকসই ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলগত দিকনির্দেশনা তুলে ধরে।

কোয়ান্টাম কম্পিউটিং (QC): এটি প্রচলিত সিলিকন যুগের সমাপ্তি ঘটিয়ে গণনা করার ক্ষেত্রে একটি 'চূড়ান্ত লাফ' হিসেবে বিবেচিত। আইবিএম, গুগল, আমাজনের মতো সংস্থাগুলি এতে বিপুল বিনিয়োগ করছে। QC-এর মাধ্যমে পরিবেশ পরিবর্তনের নির্ভুল পূর্বাভাস, টেকসই নির্মাণসামগ্রী এবং উন্নত ডেটা সুরক্ষা সম্ভব। তবে এর সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো এটি বিদ্যমান এনক্রিপশন অ্যালগরিদমগুলিকে ভেঙে দিতে পারে, যা বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি। এই ঝুঁকি মোকাবিলায় পোস্ট-কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি (PQC)-এর সাথে এর ব্যবহারকে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

বায়োটেকনোলজি ও জীবন বিজ্ঞান: জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (যেমন CRISPR), টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং এবং 3D বায়োপ্রিন্টিং স্বাস্থ্যসেবাকে বিপ্লব ঘটাচ্ছে। কৃষি বায়োটেকনোলজি পরিবেশবান্ধব উপায়ে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ু-সহনশীল ফসলের উন্নয়নে সহায়তা করছে, যা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। কার্বন ক্যাপচার ও স্টোরেজ (CCUS)-এর মতো বৈশ্বিক কৌশলের পাশাপাশি বায়োটেক-ভিত্তিক 'ফ্রুগাল ইনোভেশন' স্থানীয়ভাবে জলবায়ু অভিযোজনে অত্যন্ত সহায়ক।

মেটাভার্স ও ভার্চুয়াল অর্থনীতি: প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা মেটাভার্সকে ইন্টারনেটের ভবিষ্যৎ হিসেবে দেখছেন। এই বৈশ্বিক বাজারটি ২০২৩ সালের USD ৯৪.১ বিলিয়ন থেকে ২০৩২ সালের মধ্যে USD ২,৩৪৬.২ বিলিয়নে পৌঁছাতে পারে (৪৪.৪% CAGR)। ব্লকচেইন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এই ভার্চুয়াল অর্থনীতির ভিত্তি তৈরি করছে। তবে এই অতি-দ্রুত প্রসারণ সমাজে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং নিঃসঙ্গতা বাড়িয়ে দিচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

এআই বাজারের প্রবৃদ্ধি ও প্রয়োগ: বৈশ্বিক এআই বাজার অভূতপূর্ব গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০৩২ সালের মধ্যে এর আকার $২.৭৪ ট্রিলিয়ন ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জেনারেটিভ এআই শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে সৃজনশীল কাজ এবং পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়াগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করে তুলছে, যা বিজ্ঞাপন শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক কৌশলগত সুবিধা দিচ্ছে।

মেশিন লার্নিং (ML)-এর আধুনিক প্রবণতা:

- মাল্টিমোডাল মেশিন লার্নিং (টেক্সট, ছবি, শব্দের সংমিশ্রণ) মানুষের সংবেদনশীল তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতাকে অনুকরণ করছে।
- কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং (QML) ভবিষ্যতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা, যা গণনার ক্ষেত্রে এক্সপোনেনশিয়াল গতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে আসে।

নৈতিকতা ও নিয়ন্ত্রণ: এআই-এর স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাখ্যাযোগ্য এআই (XAI) টুলস অপরিহার্য। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU-এর AI Act)-এর মতো প্রবিধানগুলি মডেলগুলিকে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা এবং জবাবদিহিতার নীতির সাথে তৈরি করার জন্য চাপ দিচ্ছে। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট পাবলিক প্লেসে নজরদারির জন্য এআই-এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব সমর্থন করে, যা নির্দেশ করে যে এআই-এর ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির ক্ষমতা এবং নৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেকার ভারসাম্যের ওপর নির্ভরশীল।

বাজারের প্রবৃদ্ধি ও হুমকি: ডিজিটাল রূপান্তরের ফলে সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে গেছে। বৈশ্বিক সাইবার নিরাপত্তা বাজার ২০৩০ সালের মধ্যে $৩৫১.৯২ বিলিয়নে পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হয়েছে (৯.১% CAGR)। এই বৃদ্ধির প্রধান চালক হলো ক্রমবর্ধমান সাইবার হুমকি, যেমন—র‍্যানসমওয়্যার (যেমন Conti) এবং লক্ষ্যবস্তু ট্রোজান আক্রমণ। ভারতে ৩৬৯ মিলিয়ন ম্যালওয়্যার সনাক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ট্রোজানরা ৪৩.৩৮%। BFSI (ব্যাংকিং, আর্থিক পরিষেবা ও বীমা) এবং স্বাস্থ্যসেবা খাত সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যবস্তু।

প্রতিরক্ষা কৌশল: সনাক্তকরণের জন্য ৮৫.৪৪% এখনও ঐতিহ্যবাহী স্বাক্ষর-ভিত্তিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে, যা উন্নত ম্যালওয়্যারের বিরুদ্ধে কার্যকর নয়। তাই, সংস্থাগুলিকে অবশ্যই আচরণ-ভিত্তিক সনাক্তকরণ এবং এআই/এমএল-চালিত প্রতিরক্ষা কৌশল গ্রহণ করতে হবে। পাসকী (Passkeys) ব্যবহার, মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন (MFA) এবং ডেটা এনক্রিপশন নিরাপত্তার ভিত্তি তৈরি করে।

কার্বন হ্রাস ও CCUS: কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি (বায়ু ও সৌর) ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৩০% ছাড়িয়ে যাবে। তবে, কার্বন ক্যাপচার ও স্টোরেজ (CCUS)-এর কার্যকারিতা এখনও অনেক কম (বিশ্বব্যাপী নিঃসরণের মাত্র ০.১% ক্যাপচার করে), যা কার্বন হ্রাসের লক্ষ্যপূরণে একটি বড় ব্যবধান নির্দেশ করে।

জলবায়ু অভিযোজন ও গ্রিন আইটি: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির জন্য জৈবপ্রযুক্তিভিত্তিক কৃষি এবং স্থানীয় 'ফ্রুগাল ইনোভেশন' অপরিহার্য। তবে, প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ার সাথে সাথে এর পরিবেশগত পদচিহ্ন, যেমন এআই-এর ক্রমবর্ধমান শক্তি ব্যবহার এবং ই-বর্জ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে ২১ বছরে মোবাইল ফোন থেকে ১০,৫০৪ টন বিষাক্ত ই-বর্জ্য উৎপন্ন হয়েছে।

কৌশলগত সমাধান হিসেবে গ্রিন আইটি নীতি প্রণয়ন, ই-বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য কঠোর মানদণ্ড তৈরি এবং জ্বালানিসাশ্রয়ী হার্ডওয়্যার (যেমন ৪ বা ৫ স্টার এনার্জি রেটিং প্রাপ্ত সরঞ্জাম) ব্যবহারকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

প্রযুক্তির এই বিপুল ক্ষমতাকে দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া আবশ্যক:

1. স্থিতিস্থাপক সাইবার বিনিয়োগ: আচরণ-ভিত্তিক সনাক্তকরণ এবং এআই/এমএল-চালিত প্রতিরক্ষা কৌশলে বিনিয়োগ বাড়ানো।
2. সবুজ ডিজিটাল নীতি: গ্রিন আইটি নীতি প্রণয়ন, ই-বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য কঠোর মানদণ্ড এবং জ্বালানিসাশ্রয়ী হার্ডওয়্যার ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
3. নৈতিক এআই কাঠামো বাস্তবায়ন: স্বচ্ছতা (XAI) নিশ্চিত করে এআই সিস্টেম স্থাপন করা এবং এআই নজরদারি সংক্রান্ত সিস্টেমগুলিতে কঠোরভাবে স্বাধীন তত্ত্বাবধানের নীতি অনুসরণ করা।
4. জলবায়ু অভিযোজন অর্থায়ন: জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির জন্য সহজ শর্তে অর্থায়ন নিশ্চিত করা এবং জৈবপ্রযুক্তিভিত্তিক স্থানীয় উদ্ভাবনে বিনিয়োগ বাড়ানো।

নদীর নামে একদিন

- রুক্মিণী হায়দার

নদীর নামে একদিন ডাকলে আমাকে,
আমি তখন বাতাসে— গাছের পাতার ফাঁকে,
তোমার কন্ঠ—
ভেসে আসে জলের গন্ধ বুকে নিয়ে,
টুকরো ভিজে আলো পড়ে থাকে পায়ের কাছে।

নদী ছিল মেঘে ঢাকা,
জল যেন স্বপ্নের মতো থেমে তীরে।
তুমি বললে, "চলো, নামি আজও,"
হাসলাম—
নদী ঠিক জানে, নামার মানে হারিয়ে যাওয়া নয়,
ফিরে আসারই অন্য নাম।

তোমার চুলে তখন বাতাস বাজে,
আমার হাতে ধরা এক মুঠো তরঙ্গ—
যেন সময়ও ভেসে যাচ্ছে নিচের দিকে,
নদীর স্রোতে,
অজানা এক শান্তির দিকে।

নদীর নামে আমরা হাঁটলাম দু'জন সেইদিন,
কথা বলিনি, তবু সব কথাই বলা হল।
তোমার চোখে জল ছিল না—
নদীর প্রতিফলন,
আমি তাকিয়ে বুঝেছিলাম,
ভালোবাসা মানে হয়তো ঠিক এই—
বয়ে চলা, থেমে না থাকা।

সন্ধ্যায় নদীর ওপারে আলো জ্বলে উঠল,
আমরা চুপচাপ বসে —
জল, আকাশ, আর একটানা হাওয়া
তারা কেউই আমাদের নাম জানত না,
শুধু চিনত সেই নীরবতাকে
যার নাম তুমি রেখেছিলে— নদী।

(সমর্পণ সেই সব নীরব সন্ধ্যাকে,
যেখানে নদী কথা বলে, আর মানুষ শোনে না—
শুধু অনুভব করে।)

বৈশ্বিক বাণিজ্য নীতির উত্থান

- থমাস মরিসন (অনুবাদ : মোহিত কাঞ্জিলাল)

২০২৫ সাল বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নীতিগত অগ্রাধিকারের এক সুস্পষ্ট পুনঃস্থাপনের মধ্য দিয়ে চিহ্নিত হয়েছে, যেখানে বাণিজ্য নীতি কার্যকলাপের তীব্র বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক শিরোনামে আধিপত্য বিস্তার করেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণগুলি ইঙ্গিত করে যে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা এক অভূতপূর্ব চাপের সম্মুখীন, যা মূলত শিল্প নীতি (Industrial Policy) এবং প্রতিরক্ষামূলক শুল্ক (Tariffs) বৃদ্ধির দ্বারা চালিত। এই নীতিগত পরিবর্তন বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রবাহকে প্রভাবিত করছে এবং ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে গুরুতর অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে।

২০২৫ সালের প্রথমার্ধে বৈশ্বিক অর্থনীতি শুল্কের মুখে "অপ্রত্যাশিত স্থিতিস্থাপকতা" দেখিয়েছে বলে IMF পর্যবেক্ষণ করেছে। এই স্থিতিশীলতা মূলত বেসরকারি খাতের কর্মতৎপরতার কারণে এসেছে, যেখানে ব্যবসায়ীরা শুল্ক আরোপের আগে আমদানি 'ফ্রন্ট-লোডিং' করেছে এবং সরবরাহ শৃঙ্খলকে দ্রুত পুনঃরুট (re-routing) করেছে। এছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক অংশীদাররা পাল্টা-শুল্ক আরোপ করা থেকে বিরত ছিল। WTO-এর মহাপরিচালক এনগোজি ওকোনজো-ইওয়েলা বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার কারণে এই স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকার বিষয়টি স্বীকার করলেও, তিনি দৃঢ়ভাবে সতর্ক করেছেন যে "আত্মতুষ্টির কোনো সুযোগ নেই।"

এই কৌশলগত পদক্ষেপগুলি কেবল স্বল্পমেয়াদী স্থিতাবস্থা প্রদান করেছে। যেহেতু নীতিগত অনিশ্চয়তা এখনও উচ্চ পর্যায়ে (মার্কিন কার্যকর শুল্কের হার এখনও ২০২৪ সালের স্তরের চেয়ে অনেক বেশি), এই সাময়িক স্থিতিস্থাপকতা শেষ পর্যন্ত ২০২৬ সালে একটি নাটকীয় 'বাণিজ্য মন্দা'র পথ তৈরি করতে পারে, যার পূর্বাভাসে পণ্য বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি ০.৫% এ নামিয়ে আনা হয়েছে।

বাণিজ্য বাধা বৃদ্ধির বর্তমান তরঙ্গ একাধিক গভীর অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক কারণ দ্বারা চালিত। এর মূল কারণগুলির মধ্যে রয়েছে কোভিড-১৯ মহামারীর পরবর্তীকালে সরবরাহ শৃঙ্খলের ভঙ্গুরতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ, জলবায়ু সংকট মোকাবিলার জন্য সবুজ ট্রানজিশনের প্রয়োজনীয়তা, এবং সর্বোপরি, ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও জাতীয় নিরাপত্তার ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য।

সম্প্রতি, সরকারগুলি অর্থনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও সক্রিয় শিল্প নীতি অবস্থান গ্রহণ করেছে। IMF এবং গ্লোবাল ট্রেড অ্যালার্টের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত নতুন গবেষণা অনুসারে, বিগত বছর বিশ্বজুড়ে ২৫০০টিরও বেশি শিল্প নীতি হস্তক্ষেপ রেকর্ড করা হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক হস্তক্ষেপ প্রমাণ করে যে শিল্প নীতি আর কেবল স্বল্পসংখ্যক দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি একটি বৈশ্বিক প্রবণতা। এই হস্তক্ষেপগুলির মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি বাণিজ্য-বিকৃতিকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বাণিজ্য নীতির ফোকাস এখন শুল্ক থেকে অভ্যন্তরীণ ভর্তুকিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। ভর্তুকি বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শিল্প নীতির হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই প্রবণতা বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার জন্য একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। ভর্তুকি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ায় (Subsidy Proliferation), WTO-এর বিদ্যমান ভর্তুকি ও কাউন্টারভেইলিং ব্যবস্থা সংক্রান্ত চুক্তি (SCM চুক্তি) এর মোকাবিলায় যথেষ্ট অপ্রতুল বলে বিবেচিত হচ্ছে। দুর্বল ভর্তুকি বিধিগুলি অতীতের শুল্ক হ্রাস আলোচনার মাধ্যমে অর্জিত বাজার প্রবেশের সুবিধাগুলিকে ক্ষুণ্ণ করে এবং শেষ পর্যন্ত একটি বিপজ্জনক "ভর্তুকি যুদ্ধ" (subsidy war)-এর দিকে নিয়ে যেতে পারে।

ভূ-অর্থনৈতিক বিভাজন (Geoeconomic Fragmentation) বিশ্ব অর্থনীতির জন্য একটি ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা প্রধানত ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা দ্বারা চালিত হচ্ছে। IMF পর্যবেক্ষণ করেছে যে ২০১৮ সাল থেকে বাণিজ্য এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) নিষেধাজ্ঞার সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিল্প সংস্থাগুলি ক্রমবর্ধমান নীতিগত অনিশ্চয়তার প্রতি সাড়া দিচ্ছে এবং ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি থেকে তাদের সরবরাহ শৃঙ্খলকে রক্ষা করার উপায় খুঁজছে। এর ফলস্বরূপ, বাণিজ্য এখন 'ডি-রিস্কিং' বা 'ফ্রেন্ড-শোরিং'-এর মতো নীতির মাধ্যমে ভূ-রাজনৈতিকভাবে সারিবদ্ধ দেশগুলির মধ্যে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

IMF-এর মডেলিং অনুযায়ী, নীতিগত বিভাজনের অর্থনৈতিক পরিণতি অত্যন্ত গুরুতর:

- 'ফ্রেন্ড-শোরিং' পরিস্থিতি: যদি দেশগুলি তাদের ভূ-রাজনৈতিক অংশীদারদের সাথে একীভূত হয়, তবে দীর্ঘমেয়াদী বৈশ্বিক জিডিপিতে ১.৮ শতাংশ পর্যন্ত স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে।
- 'রিশোরিং' পরিস্থিতি: যদি দেশগুলি অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের উপর নির্ভরতা বাড়িয়ে দেয়, তবে বৈশ্বিক জিডিপিতে স্থায়ী ক্ষতি ৪.৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।

এই অর্থনৈতিক ক্ষতিগুলি বৈশ্বিক জীবনযাত্রার মানের উপর এমন ক্ষতি আরোপ করতে পারে যা কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সৃষ্ট ক্ষতির মতোই গুরুতর।

বাণিজ্য নীতির ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তা এবং জটিলতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য স্বচ্ছতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। IMF এবং

WTO এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি যৌথ নজরদারি টুল তৈরি করেছে: IMF-WTO ট্যারিফ ট্র্যাকার। এটি প্রয়োগকৃত শুল্কের পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করে, যা নীতিগত অনিশ্চয়তা হ্রাস করার জন্য অপরিহার্য।

স্বল্পোন্নত উন্নয়নশীল দেশগুলি (LDCs) বৈশ্বিক বাণিজ্য মন্দা এবং নীতিগত অস্থিরতার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে, কারণ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তাও হ্রাস পাচ্ছে।

ভবিষ্যতে বহুমুখী বাণিজ্য ব্যবস্থার কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য SCM চুক্তির কাঠামোগত সংস্কার করা, নির্দিষ্ট খাতের জন্য নিয়ম প্রবর্তন করা এবং অ-বাজার অর্থনীতির জন্য কার্যকর নিয়ম প্রণয়ন করা অপরিহার্য। এই পদক্ষেপগুলি কার্যকর না হলে, ভর্তুকি যুদ্ধ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বহুমুখী বাণিজ্য ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙে যেতে পারে। ২০২৫ সালের স্থিতিশীলতাকে ভুলভাবে দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়; বরং এটি একটি গভীর বাণিজ্য মন্দার পূর্বসূচনা হতে পারে, যা মোকাবিলার জন্য সমন্বিত বৈশ্বিক নীতি অপরিহার্য।

যখন সময় ফেরে

- দেবাশিস চক্রবর্ত্তী

সকালে ঘুম ভাঙতেই অরিন্দম মুখার্জি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখলেন রংহীন আকাশ। কবিতার মতো শীতল সেই সকালে কলকাতা যেন কিছুটা মন্থর—কিন্তু তাঁর মনে ছিল এক অচেনা উৎসাহ। দীর্ঘকাল ধরেই অরিন্দম লেখার সামনে বসে চেয়ার টেনে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছিলেন না। পুরনো কালজয়ী পাণ্ডুলিপিগুলো খুলে দেখলে রচনার সেই খাঁটি গন্ধ পেতেন, কিন্তু নতুন কোনো শব্দ জন্মাত না। তাই সেই সকালে তিনি একটি সিদ্ধান্ত নিলেন—কয়েকটা দিন শহরের কোলাহল থেকে দূরে, প্রকৃতির কাছাকাছি কাটাবেন; হয়তো সেখানে একটা গল্প ফিরে আসবে।

টিকিট কাটা হয়ে গেল অনায়াসে—গন্তব্য মাইথন। সবে-সবে ঋতু বদলের গন্ধ, গাছপালা যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। সঙ্গে রাখলেন কৌতুকের একটি ছোট অ্যালবাম, একটা পুরনো কলম, আর একটি লেখার খাতা। পুত্র অর্ণব, পুত্রবধূ মৌ, আর নাতনি ইরা—তারা তিনজনই মুখে বড় একটা হাসি নিয়ে উঠল যখন অরিন্দম বললেন, "চলো, কয়েকটা দিন বাইরে থাকি। হয়তো গল্পটা সেখানেই কোনো অলৌকিক স্থানে লুকিয়ে আছে।"

ট্রেনে ওঠার সকালে অর্ণব ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বলল, "বাবা, মোবাইলে পুরো ট্রিপটা রেকর্ড করব—ছবি, ভিডিও, সব।" মৌ হেসে পরামর্শ দিল—"আরামের জন্য একটু হালকা প্ল্যান করো, ভালো করে খাওয়াদাওয়া, আর একটু বিশ্রাম।" ইরা, যে নাতনি হলেও সবসময় নতুন অভিজ্ঞতার খিদে নিয়ে ঘোরে, ক্যামেরা হাতে জানালায় চেপে বলল, "দাদু, রাস্তার পাশের সবটুকু ধরব। পাহাড়, বাঁশঝাড়, লোকজন—সব!" রেলযাত্রা ছিল ধীর কিন্তু মধুর। জানালার বাইরে লাল মাটি, সোনালি ধান, মাঝেমধ্যে একদল ছেলে মাঠে ঘাস কাটছে—সবকিছুই যেন ছবির ফ্রেমে জমে উঠছে। অরিন্দম এক কোণে বসে মৃদু আওয়াজে বলছিলেন, "এইসব দৃশ্যগুলোই আগে আমার গল্পে আসত। আজ দেখছি, আমি কাঁপছি আবার।" ইরা কৌতুক করে বলল, "দাদু, কাঁপলে ধরে রাখব—ফটো তুলি।" সবাই হেসে উঠল।

মাইথন পৌঁছতেই ভ্রমণটা আরও জীবন্ত হলো। ড্যাম, জলের বিশাল বিস্তার আর চারপাশের সবুজ গাছ—সবকিছু মিলিয়ে এক আলো-ছায়ার খেলা। স্থানীয় ট্যাক্সি বা অটো না নিয়ে তারা নৌকায় উঠল—একটি ছোট নৌকাই তাদের মজুমদার নিবাস পর্যন্ত নিয়ে যাবে। নৌকার মাঝেই ইরা জানালায় চেপে বলল, "দেখো, ড্যামের জলটা কেমন শান্ত! মনে হচ্ছে আকাশ নেমে বসেছে।" অরিন্দম সামান্য নির্বাক হয়ে দেখছিলেন, মাঝে মাঝে কলমটা বের করে নোট লিখে নিচ্ছিলেন—কয়েকটা লাইন, একটি শব্দ, একটি বোধময় প্রস্তাবনা।

মজুমদার নিবাস ছোট কিন্তু মজবুত। পুরনো কাঠের সিঁড়ি, লম্বা বারান্দা, আর সেই বারান্দায় ঝুলে থাকা একটি পুরনো ঘড়ি—যার একটি কাঁটা থেমে আছে। বাড়ির বাইরের অংশটা একটু জীর্ণ, কিন্তু ভেতরটা পরিষ্কার। গৃহকর্মীর সাজানো-গোছানোর মধ্যে একটা গোপন-সুলভ ঐশ্বর্য পরিলক্ষিত হয়—পুরনো মোমবাতির ধারক, একটি মানচিত্র, এক কোণে রাখা ছিল মাটির টিকে-টিকিযুক্ত থালা। পরিচারক হাসিমুখে বলল, "স্যার, এখানে রাতগুলো বেশ শান্ত হয়। তবে কখনও কখনও সময়ের মতো একটা হাওয়া চলে—মনে হয় সবকিছু পাল্টে যাচ্ছে।" সবাই কৌতুক করে বলল, "ওটা কি তবে একটা ঠিকানা?" কিন্তু ভেতরে ভেতরে অরিন্দমের মন কিছুটা উত্তেজিত হলো—কারণ এমন গোপন নির্দেশনা পুরনো লেখকের ভালো লাগে।

প্রথম রাতটা ছিল বজ্রপাত মিশ্রিত। জানালার কাচে বৃষ্টি লাথি মেরে পড়ছিল, দূরে ড্যামের জল চাঁদের আলোয় ঝলকাচ্ছিল। খাওয়ার সময় মৌ খেয়াল করে বলল, "বাইরে কেউ আছেন কি?" কিন্তু বাইরে শুধু পাহাড়ের মায়াবী নীরবতা। রাতে অরিন্দম ঘুমে গেলেন বালিশে একটু অস্বস্তি নিয়ে—দীর্ঘদিনের অনুশোচনা, পুরনো লেখা নিয়ে চিন্তা—কিন্তু এর মধ্যে একেকটি স্বপ্নে ভেসে উঠল পুরোনো পথ, পুরনো কোনো গান, এবং অতীতের কোনো অস্পষ্ট মুখ। ইরা-সহ বাকিরাও কেবল হালকা নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালটা নতুন রোদে ভরা। বারান্দায় নাস্তা সাজানো—সাদা পিঠে, আলু-ভাজা, লাল চা। সবাই কেমন অচেনা আলোর মতো উদ্ভাসিত। অরিন্দম টেবিলে বসে হালকা কফি খাচ্ছিলেন; ইরা জানালায় চেপে দূরত্বের ছবি তুলছিল। হঠাৎ মৌ তাঁর দিকে চেয়ে বলল, "বাবা, আপনার কি মনে হয়, আজ সকালে আপনি ভালো আছেন?" অরিন্দম একটু চমকে বললেন, "হ্যাঁ… আজ যেন একটু আলাদা।" সবাই হেসে বলল—"এটাই তো ছুটি।" কিন্তু সেই হাসিতে একটা কুঁচকানো, একটু বিস্ময় মিশে ছিল—যেমন কেউ বলবে আজ যেন সবাই একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে। অর্ণব আয়নায় চেয়ে বলল, "দাদু, আপনার চেহারা… কিছুটা বদলেছে?" অরিন্দম আয়না দেখে নিজেই অবাক—চোখের কোণে একটা নতুন দীপ্তি, গালের হালকা ক্লান্তি কমে গেছে। তিনি মৃদু করে বললেন, "শুধু আলো, শুধু বাতাস—এগুলো অনেককিছু বদলে দেয়।"

নৌকা, খেজুর গাছ, পাহাড়ি পথ—প্রতিটি জায়গায় দিনের আলোর মতো গল্প লেপ্টে আছে। দুপুরে তারা নৌকায় নামিয়ে দিল একটি ছোট গ্রামে—একখানা মাটির ঘর, সামনে শিশুদের কোলাহল, গৃহবধূরা কাঁথা সেলাই করছে। তারা হাতের তৈরি রুটি খেতে বসল—মাছের ঝোল, সরল আলুর ভাজি, আর এক ছোট হাঁড়ি পিঠে। স্থানীয় লোকেরা হাসিমুখে তাদের আপ্যায়ন করল; একজন বৃদ্ধ মহিলা বলল, "এখানে সবাই পাহাড়ের আঙিনাকে বড়ো করে দেখে—এই জল আর গাছ আমাদের ধন।" ইরা প্রশ্ন করল, "এই এলাকায় সব কি একরকম?" বৃদ্ধা মাথা নেড়ে বলল, "না—এখানে গল্প আছে। কেউ জানে না সবাই কেমন।"

দিনের শেষে ভোরের আলোয় তারা ফিরে এল মজুমদার নিবাসে। অরিন্দমের মনটা ভরে উঠল—একটু করে কিছু শব্দ জমা হচ্ছিল তাঁর কলমে। তিনি বুঝতে পারলেন, হয়তো এই ছুটি তাঁর জন্য কেবল বিশ্রাম নয়—এটা হবে নতুন গল্পের শুরুর ধাক্কা। কিন্তু সন্ধ্যার আগে একটি অনুভূতি এসে বলল—এই দ্বীপ, এই মানুষ, এই খাবার—সবকিছু যেন কেবল ভ্রমণ নয়, বরং কিছু বড়ো রাত্রের জন্য প্রস্তুতি।

রাতের আকাশে তারা বারান্দায় বসে চাঁদের আলোতে গল্প করল। অর্ণব বলল, "বাবা, এই যে কিছুকাল আপনার লেখা বন্ধ, আপনি কি ভেবেছেন আর আপনার জন্য কি লেখা শেষ হবে?" অরিন্দম চুপ করে বললেন, "লেখা কখনও শেষ হয় না, কখনো খোঁজে না। হয়তো এখানে সে খোঁজ পাওয়া যাবে।" ইরা জানালো, "দাদু, আমি স্বপ্নে একটা গান শুনেছিলাম—কেউ বাঁশি বাজাচ্ছিল।" সবাই হেসে নিতান্তই পাত্তা দিল, কিন্তু মনের ভিতর সেই বাঁশির সুর আরেকটু করে অনুরণন করল—যেমন এমন কিছু অপেক্ষা করছে, যা তাঁদের ভাবতেই বাধ্য করছে।

অরিন্দম ফিরে এসে কাগজখাতা খুললেন, কলম রেখে প্রথম লাইনটা লিখলেন—"যখন একটি দ্বীপ তোমাকে ডাকবে, তখন বুঝবে সময়ের ভ্রমণ শুরু।" তারপর তিনি জানালার বাইরে তাকালেন—ড্যামের উপর কুয়াশার লহমা ভেসে যাচ্ছিল, এবং বাতাসে নরম একটি গন্ধ —মাটির, পাতার, আর সময়ের।

এইভাবেই তাদের যাত্রা শুরু হলো—ভ্রমণ, খাবার, মানুষের কথা আর অচেনা সুরে মিশে। এবং অরিন্দম বুঝতে পারলেন—এই ছুটি হয়তো শুধু ছুটি নয়; কিছু বেশি—কিছু স্মৃতি, কিছু প্রতিজ্ঞা, যা অপেক্ষা করে ছিল বহুদিন ধরে।

সন্ধ্যার আলো ধীরে ধীরে জলের গায়ে পড়ে নরম কমলা হয়ে যাচ্ছিল। ড্যামের ঢেউগুলো তীরে এসে পড়ছে যেন নিঃশব্দে কারোর সঙ্গে কথা বলছে। মজুমদার নিবাসের উঠোনে ইরা বসে মোবাইল দিয়ে সূর্যাস্তের ভিডিও তুলছিল। আকাশে পাখির সারি, নিচে গাছের ছায়া—সব মিশে গেছে এক গোপন শান্তিতে।

অর্ণব ও মৌ বারান্দার পাশে বসে চা খাচ্ছিল। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছিল ধীর গতিতে, আর সেই ধোঁয়ার মধ্যে জল আর মাটির গন্ধ মিশে আছে। মৌ বলল, — "এই বাড়িটা দেখতে পুরনো হলেও ভেতরটা আশ্চর্য পরিষ্কার। কেউ নিয়ম করে যত্ন নিচ্ছে বুঝি?" অর্ণব হাসল, "হয়তো কোনও কেয়ারটেকার আছে। কাল দেখা যাবে।"

অরিন্দম তখন ভেতরের ঘরটা ঘুরে দেখছিলেন। ঘরের দেওয়ালে পুরনো কিছু ছবি ঝুলছে—কোনওটায় নদী, কোনওটায় পাহাড়। কিন্তু একটি ছবিতে চারজন যুবক-যুবতী দাঁড়িয়ে আছে এক অশ্বত্থ গাছের নিচে। সেই ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর গায়ে কাঁটা দিল। মুখগুলো স্পষ্ট নয়, তবু অদ্ভুতভাবে পরিচিত মনে হলো। তিনি একটু চুপ করে রইলেন, তারপর ছবির নিচে লেখা হরফটা পড়তে গেলেন—কিছু অস্পষ্ট নাম, কিন্তু যেন "অর্ণব" শব্দটা চোখে পড়ল। ইরা এসে জিজ্ঞেস করল, "দাদু, কী দেখছো?" অরিন্দম একটু থেমে বললেন, "এই ছবিটার গল্পটা যদি জানতাম!"

বাইরে তখন রাত নামছে। বাতাসে হালকা ঠান্ডা, জলের ওপর চাঁদের আলো পড়ে একধরনের রুপালী ঝলক ছড়াচ্ছে। পরিচারক এসে জানাল, "ডিনার রেডি স্যার। মাছের ঝোল, ভাত আর টাটকা সবজি।" খাবারের টেবিলে চারজন একসঙ্গে বসে খেতে খেতে হাসাহাসি করছিল। খাবারের গন্ধে ঘরটা ভরে উঠেছে। মৌ বলল, — "দারুন, কী সুন্দর রান্না!" ইরা বলল, "কে বানিয়েছে ওগুলো?" পরিচারক জবাব দিল, "আজ সকালে এক রাঁধুনি এসে বলে গেল, কাল থেকে সে আসবে। আজ তার তৈরি নয়, তবে এই একই মশলার গন্ধ থাকবে কালও।" সবাই একটু অবাক হলেও পাত্তা দিল না। রাতের খাওয়া শেষ করে তারা বারান্দায় এসে বসল। দূরে জলের ওপারে পাহাড়ের কালো ছায়া। বাতাসে হালকা মহুয়ার গন্ধ।

ইরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "দাদু, এখানে খুব শান্ত লাগে। শহরের মতো নয় একদম।" অরিন্দম মৃদু গলায় বললেন, "শান্ত জায়গারও একটা আওয়াজ থাকে। একটু কান পাতলে শোনা যায়।" ঠিক তখনই, এক অচেনা শব্দ ভেসে এল—বাঁশির সুর। কোথা থেকে আসছে বোঝা গেল না, কিন্তু সুরটা যেন জলের বুক ফুঁড়ে আসছে। ইরা বলল, "শুনছো? কেউ বাজাচ্ছে!" অর্ণব চারদিক দেখে বলল, "এই দ্বীপে তো কেউ নেই আমাদের ছাড়া!" সবাই একটু চুপ করে রইল। বাঁশির সুরটা কয়েক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

ঘরে ফিরে সবাই আলাদা ঘরে শুয়ে পড়ল। বাইরে বৃষ্টি শুরু হলো। জানালার কাচে বৃষ্টির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। অরিন্দম ঘুমোতে পারলেন না। তাঁর মনে হলো কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, যেন তাকিয়ে দেখছে। জানালার কাঁচের ওপারে ঝাপসা এক ছায়ামূর্তি দেখা গেল—মনে হলো বাঁশিওয়ালা! তিনি চোখ মেললেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়াটা মিলিয়ে গেল। তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন—সময় থেমে গেছে। ঘড়ির কাঁটা যেন আটকে আছে ঠিক ১১টা ৩৫-এ। অরিন্দম ধীরে ধীরে টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। কিন্তু কান পেতে রইলেন—দূরে কোথাও আবার সেই সুর বাজছে।

সকালে প্রথম সূর্যের আলো ঘরে ঢুকতেই মৌ দরজা ঠেলে বলল, — "বাবা, সবাই ঠিক আছেন তো? রাতে বজ্রপাত হয়েছিল, শুনলেন?" অরিন্দম একটু হাসলেন, "হ্যাঁ, শুনেছিলাম। তবে মনে হলো যেন শুধু বৃষ্টি নয়, কেউ যেন ডাকছিল।" বারান্দায় বেরিয়ে তারা চারজনই দেখল—দূরে ড্যামের জল রোদে চিকচিক করছে, কিন্তু কোথাও যেন একটু ভিন্ন আলো। অর্ণব চা হাতে দাঁড়িয়ে বলল, "আজ যেন বাতাসটাও অন্যরকম।"

ইরা চুপ করে বলল, "দাদু, আজ আয়নায় তাকিয়ে আমার মনে হলো, আমি অন্য কেউ।" অরিন্দমের চোখে কৌতূহল, ভয় আর বিস্ময় একসঙ্গে ফুটে উঠল। তিনি জানতেন—এই যাত্রা কেবল ভ্রমণ নয়, কিছু একটা শুরু হচ্ছে আজ থেকে।

(ক্রমশঃ)

বাণিজ্য সংঘাত: কুয়ালালামপুর কাঠামো (অক্টোবর ২০২৫)

- অপূর্ব সাহা

২০২৫ সালের অক্টোবরের শেষ দিকে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ-ইস্ট এশিয়ান নেশনস (ASEAN) সম্মেলনের সাইডলাইনে উচ্চ-পর্যায়ের আলোচনার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন একটি নতুন বাণিজ্য "কাঠামো" (framework) নিয়ে প্রাথমিক ঐকমত্যে পৌঁছেছে। এই সমঝোতার প্রধান লক্ষ্য ছিল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা এড়ানো এবং বাণিজ্য সংঘাতকে আরও মারাত্মক পর্যায়ে উন্নীত করা থেকে বিরত থাকা। এর ফলে নভেম্বরের ১ তারিখ থেকে চীনা আমদানির ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত ১০০% শুল্ক আরোপের হুমকি বাতিল করা হয়, এবং একইসঙ্গে চীনের পক্ষ থেকে কৌশলগত বিরল মৃত্তিকা (Rare Earth) খনিজ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের মারাত্মক পদক্ষেপও স্থগিত করা হয়।

মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট এই ঘোষণাকে "খুব উল্লেখযোগ্য কাঠামো" (very substantial framework) হিসেবে অভিহিত করেছেন, যা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর মধ্যে চূড়ান্ত আলোচনার ভিত্তি স্থাপন করবে। এই অগ্রগতি একটি পূর্ণাঙ্গ বৈশ্বিক বাণিজ্য যুদ্ধের ঝুঁকি হ্রাস করেছে এবং বাজারগুলিতে তাৎক্ষণিক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

২০২৫ সালের অক্টোবর মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা আবারও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চীনা আমদানির ওপর নভেম্বরের ১ তারিখ থেকে নতুন করে "ট্রিপল-ডিজিট" (১০০%) শুল্ক আরোপের হুমকি দেন। এই কঠোর পদক্ষেপের মূল কারণ ছিল চীনের পাল্টা হুমকি—কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিরল মৃত্তিকা খনিজ এবং ম্যাগনেটের উপর ব্যাপক রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আরোপের আলোচনা। বিরল মৃত্তিকা খনিজগুলি ফাইটার জেট, স্মার্টফোন এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির মতো কৌশলগত উচ্চ-প্রযুক্তি পণ্যগুলির জন্য অপরিহার্য। চীনের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ মার্কিন সামরিক ও উচ্চ-প্রযুক্তি সরবরাহ চেইনকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করার ক্ষমতা রাখে।

মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট স্বীকার করেন যে ১০০% শুল্ক আরোপের হুমকি তাকে চীনের সাথে আলোচনার জন্য "বিরাট লিভারেজ" এনে দিয়েছিল, যার ফলস্বরূপ চীন তাদের বিরল মৃত্তিকা নিয়ন্ত্রণ স্থগিত করতে রাজি হয়। কুয়ালালামপুরে এই উচ্চ-স্তরের আলোচনাটি ছিল অত্যন্ত কঠোর ও তীব্র। চীনা আলোচক লি চেনগাং আলোচনাটিকে "খুব তীব্র পরামর্শ" হিসেবে বর্ণনা করেন। এই সংকুচিত সময়সীমা আলোচনার এজেন্ডাকে দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত সংস্কারের পরিবর্তে কেবল "তাৎক্ষণিক সংকট প্রতিরোধে" সীমাবদ্ধ রাখে।

কুয়ালালামপুরে অর্জিত কাঠামোটি একটি পূর্ণাঙ্গ বা স্থায়ী চুক্তি না হলেও, এটি এমন কয়েকটি মূল বিষয়ের সমাধান করেছে যা বিশ্ব অর্থনীতিকে বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল।

- শুল্ক স্থগিতাদেশ: কাঠামোর সবচেয়ে তাৎক্ষণিক সাফল্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নভেম্বরের ১ তারিখের ১০০% শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা বাতিল করা।
- বিরল মৃত্তিকা স্থগিতাদেশ: চীন তাদের প্রস্তাবিত বিরল মৃত্তিকা রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ "এক বছরের জন্য" স্থগিত করতে সম্মত হয়েছে। এই স্থগিতাদেশটি বিশ্বব্যাপী উচ্চ-প্রযুক্তি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ "শ্বাস নেওয়ার সুযোগ" প্রদান করে।
- অর্থনৈতিক ও কৌশলগত অঙ্গীকার: এই কাঠামোতে চীনের পক্ষ থেকে মার্কিন কৃষি পণ্য (বিশেষত সয়াবিন) ক্রয়ের "উল্লেখযোগ্য" প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, এটি ফেন্টানিল সংকট মোকাবিলায় চীনের সাথে সহযোগিতা এবং টিকটক (TikTok)-এর মালিকানা হস্তান্তরের বিষয়ে একটি "চূড়ান্ত চুক্তি" অন্তর্ভুক্ত করেছে।

ফেন্টানিল এবং টিকটক-এর মতো বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তি প্রমাণ করে যে বাণিজ্য এখন কেবল অর্থনৈতিক বিনিময় নয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ ও তথ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে বাণিজ্য লিভারেজ ব্যবহার করছে।

অক্টোবরের শেষ দিকে অর্জিত এই কাঠামোটি বিশ্ব অর্থনীতিতে তাৎক্ষণিক স্থিতিশীলতা আনলেও, এটি চীন-মার্কিন বাণিজ্য সংঘাতের মূলে থাকা দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত দুর্বলতাগুলির কোনো সমাধান করেনি। এই সমঝোতাকে সমালোচকরা কেবল "সংকট প্রতিরোধ" হিসেবে দেখছেন, যা স্থায়ী শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ।

আলোচনার সময়সীমার চাপ আলোচকদেরকে ব্যাপক কাঠামোগত সংস্কারের আলোচনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ফলস্বরূপ, মেধা সম্পত্তি (IP) সুরক্ষার বিস্তারিত বিধান, জোরপূর্বক প্রযুক্তি হস্তান্তরের নিয়মাবলী, এবং চীন কর্তৃক সরবরাহকৃত শিল্প ভর্তুকি (industrial subsidies) সংক্রান্ত মূল বিরোধগুলি এই কাঠামোর মাধ্যমে মীমাংসিত হয়নি।

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, এই সমঝোতার ঠিক বিপরীতে, ইউএস বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার ঘোষণা করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের 'ফেজ ওয়ান' চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে একটি নতুন সেকশন ৩০১ (Section 301) তদন্ত শুরু করেছে। ইউএসটিআর-এর এই পদক্ষেপ ইঙ্গিত দেয় যে পাঁচ বছর পরও চীন মূল কাঠামোগত পরিবর্তনগুলি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এই মৌলিক আদর্শগত পার্থক্যই প্রযুক্তিগত ডিকপলিং (decoupling) বা আংশিক বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যতক্ষণ না চীন তার ভর্তুকি এবং বাজারের হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত পদ্ধতি পরিবর্তন করে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাণিজ্য উত্তেজনা

কেবল সাময়িকভাবে প্রশমিত হতে পারে, কিন্তু সংঘাতের ঝুঁকি স্থায়ীভাবে বহাল থাকবে। এই কাঠামো তাই স্থায়ী শান্তি নয়, বরং "শত্রুতার একটি বিরতি" (a pause in hostilities) হিসেবে কাজ করবে।

পথে পথে - কালিম্পঙ

- আলোরেখা বসু

ভোরের আলো তখনও ঠিকমতো ফুটে ওঠেনি। জানালার বাইরে ছায়ার মতো গাছেরা নড়ছে, কোথাও একটা কাক ডেকে উঠল—যেন যাত্রার সংকেত। তিনজনের ছোট্ট পরিবার—বাবা, মা আর ছেলে—তাদের বহুদিনের ইচ্ছের পাহাড় সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছে আজ। গন্তব্য—কালিম্পঙ।

বাবা অফিস থেকে সপ্তাহখানেক ছুটি পেয়েছেন, মা অনেক আগেই ব্যাগ গোছানো শেষ করেছেন। ছেলে টিটো খুশিতে উচ্ছ্বসিত—সে প্রথমবার পাহাড় দেখতে যাচ্ছে। ট্রেনে চেপে রওনা হতেই জানালার বাইরে ছুটতে থাকা দৃশ্যপট যেন নতুন রঙে ভরে উঠল। ধানক্ষেত, ছোট ছোট স্টেশন, দূরে নদীর রেখা—সব মিলিয়ে ভোরের দেশ যেন এক চলমান চিত্রকাব্য।

শিলিগুড়ি পৌঁছতেই বাতাসে পাহাড়ি গন্ধ মেশা শুরু হল। চা-বাগানের সবুজ ঢেউ চোখে লাগে, দূরে টিলার সারি যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। সেখান থেকে গাড়ি করে কালিম্পঙের পথে উঠতে উঠতে পথের রঙ পাল্টে যায়—মাঝে মাঝে মেঘ এসে জানালা ছুঁয়ে যায়, কোথাও জলপ্রপাতের কলতান, কোথাও পাহাড়ের কোলে ছোট্ট গ্রাম।

টিটো জানালায় মুখ গুঁজে রেখেছে—"দেখো মা, মেঘটা আমাদের গায়ে লাগল!"
মা হাসলেন, বললেন, "হ্যাঁ রে, এখানে মেঘও বন্ধুত্ব করতে আসে।"
বাবা তখন নিঃশব্দে গাড়ির জানালা দিয়ে তাকিয়ে—জীবনের ক্লান্ত দিনগুলোর পর এই পাহাড়ি নিস্তব্ধতাই যেন তাঁকে নতুন করে জাগিয়ে তুলছে।

রাস্তার মোড় ঘুরলেই চা-বাগানের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় তিস্তা নদী। সবুজের মাঝখানে রুপোলি ধারা—তার স্রোত যেন জীবনের মতোই নিরন্তর, বাঁক-বাঁক, তবু এগিয়ে চলা।

দুপুর নাগাদ পৌঁছোনো গেল কালিম্পঙে। শহরটা ছোট, শান্ত, কিন্তু প্রাণে ভরপুর। রাস্তার ধারে টিনের ছাউনি দেওয়া দোকান, তিব্বতি মোড়ের কাছে লাল, হলুদ, নীল প্রার্থনা-পতাকা বাতাসে দোল খায়। দূরে পাহাড়ের ঢালে ছোট্ট মঠ, আর তার গায়ে রোদে ঝিলমিল করা ঘণ্টার আলো।

হোটেলে ব্যাগ রেখে তারা বেরোল ডেলো হিল দেখতে। উপরে ওঠার পথে শীতল হাওয়া মুখে লাগে, নিচে পুরো কালিম্পঙ শহর এক খেলনার মতো ছড়িয়ে। দিগন্তে কানচেনজঙ্ঘা দেখা গেল মেঘের ফাঁক গলে—সাদা, গম্ভীর, অনড়। মা বললেন, "এটাই তো জীবনের শান্তি—দূর থেকে দেখা, তবু আপন করে নেওয়া।"

কালিম্পঙের মানুষজনের মুখে এক মিষ্টি হাসি। দোকানের বুড়ো লেপচা ভদ্রলোক গরম চা দিতে দিতে বললেন, "এই পাহাড় আমাদের মা, সাহেব। নিচের দুনিয়া যত ব্যস্ত, এখানে দিন কাটে মেঘের সঙ্গে।"
টিটো তখন চায়ের ধোঁয়া দেখে বলছে, "দেখো বাবা, মেঘটা কাপের ভেতরেও আছে!"

পরদিন সকালে তারা গেল জাং ধোক পালরি ফোদাং মঠে। রঙিন দেওয়ালে আঁকা বুদ্ধের জীবনকাহিনি, ভিতরে মোমের গন্ধ আর প্রার্থনার ধ্বনি—সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত প্রশান্তি।
তারপর পাইন ভিউ নার্সারি—রঙিন অর্কিডে ভরা, যেখানে ফুলের পাপড়িতেও পাহাড়ি শিশির ঝুলে থাকে। মা কয়েকটা ছোট্ট গাছ কিনলেন, বললেন, "এদের সঙ্গে এই পাহাড়ের একটা অংশ বাড়ি নিয়ে যাব।"

বিকেলে তারা ঘুরে এল তিস্তা ভিউ পয়েন্টে। নিচে নদীর বয়ে চলা আর উপরে পাহাড়ের রোদে খেলা—সেই দৃশ্যের সামনে শব্দ হারিয়ে যায়। বাবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন—এই শান্তি তিনি বহুদিন খুঁজছিলেন।

শেষ দিন সকালে আবার গাড়ি নামছে শিলিগুড়ির পথে। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে সূর্যের আলো গাছের পাতায় ঝিকমিক করছে। টিটো চুপচাপ, মাঝে মাঝে ফিরে তাকাচ্ছে—যেন পাহাড়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভাঙতে মন চায় না। মা বললেন, "পাহাড়ে যে একবার যায়, তার মনে মেঘ লেগেই থাকে।"

গাড়ির কাচে জলকণার মতো স্মৃতি জমে—চায়ের দোকানের গন্ধ, মঠের ঘণ্টা, হিমেল হাওয়া, আর হরিণের মতো ছুটন্ত তিস্তা।

কালিম্পঙ ভ্রমণ তাদের জীবনে এনে দিল এক অন্যতর প্রশান্তি।
শহরের ব্যস্ততা থেকে দূরে এসে তারা বুঝল—প্রকৃতির কাছে মানুষ ছোট, কিন্তু সেই ছোটত্বেই আছে মুক্তি। পাহাড় শেখাল, স্থির থাকলেও কেমন করে মন উড়তে পারে।

বাবা ফিরে গিয়ে আবার কাজ শুরু করলেন, কিন্তু মন মাঝে মাঝে ভেসে যায় সেই মেঘে ঢাকা রাস্তায়।
মা বারান্দায় বসে চুপিচুপি সেই পাহাড়ি অর্কিডগুলোর যত্ন নেন।
আর টিটো প্রতিদিন স্কুলের খাতার ফাঁকে লিখে রাখে—"আমি আবার কালিম্পঙে যাব।"

শেষে থাকে শুধু এক অনুভব:
পাহাড়ের নীরবতা শব্দে লেখা যায় না, সেটি কেবল হৃদয়ে থেকে যায়—
এক ফোঁটা মেঘ হয়ে, এক চিরন্তন জলচিহ্ন হয়ে।

গ্রামীণ নবজাগরণ: স্টার্টআপ, স্বনির্ভরতা ও কর্মসংস্থান

- বিশাল ছেত্রী

ভারতে গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন বর্তমানে এক নবজাগরণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা মূলত গ্রামীণ স্টার্টআপ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHGs), এবং যুগান্তকারী ডিজিটাল আর্থিক পরিকাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। গ্রামীণ শিল্পায়ন এবং MSME (অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ) ক্ষেত্র এই পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। গ্রামীণ অঞ্চলে MSME উদ্যোগের সংখ্যা শহরাঞ্চলের প্রায় সমতুল্য, যা প্রমাণ করে গ্রামীণ অর্থনীতি ভারতের উদ্যোগ বাস্তুতন্ত্রের বৃহত্তম ভিত্তি।

ভারতের গ্রামীণ অর্থনৈতিক পুনরুত্থানে সরকার দুটি মূল কর্মসূচির মাধ্যমে নেতৃত্ব দিচ্ছে:

- দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা – জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (DAY-NRLM): এই মিশনের অধীনে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের SHG-এর সঙ্গে যুক্ত করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১৭ লক্ষেরও বেশি SHG-কে ২৭,৯১১ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
- স্টার্টআপ ভিলেজ এন্টারপ্রেনারশিপ প্রোগ্রাম (SVEP): এটি DAY-NRLM-এর একটি উপ-স্কিম, যা সমন্বিত আইসিটি (ICT) কাঠামোর মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারগুলিকে, বিশেষত মহিলাদের, উদ্যোগ স্থাপনে সহায়তা করে। SVEP মাত্র দুই বছরে প্রায় ১.৩ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে।

এই উদ্যোগগুলি ছাড়াও জল জীবন মিশন (JJM) এবং স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ (SBM-G)-এর মতো পরিকাঠামোগত কর্মসূচিগুলি মহিলাদের 'সময় দারিদ্র্য' (Time Poverty) হ্রাস করে অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের হার বাড়াতে সহায়ক হচ্ছে। এছাড়া, 'স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া' প্রকল্পের মতো নীতিগত পদক্ষেপগুলি এসসি/এসটি এবং মহিলা উদ্যোগপতিদের প্রাথমিক মূলধন সমস্যা মোকাবিলায় জোর দিচ্ছে।

গ্রামীণ শিল্পায়নকে গ্রাম উন্নয়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সম্মুখ (Forward) এবং পশ্চাৎ (Backward) উভয় সংযোগ স্থাপন করে, যা গ্রামীণ কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যমান ছদ্মবেশী বেকারত্ব (Disguised Unemployment) এবং অর্ধ বেকারত্ব মোকাবিলায় মূল হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। গ্রামীণ শিল্পায়ন মূলত তিন ধরনের শিল্পের উপর নির্ভরশীল: কুটির শিল্প, হস্তশিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প। শ্রমশক্তির ক্রমবর্ধমান অংশ কৃষি থেকে সরে এসে মাধ্যমিক এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে জীবিকা নির্বাহের দিকে ঝুঁকছে।

নতুন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলি গ্রামীণ উদ্যোগপতিদের জন্য রাজস্বের নতুন পথ খুলে দিচ্ছে, যেমন:

- কৃষি-পর্যটন (Agri-Tourism): কৃষি এবং পর্যটনকে একীভূত করে আঞ্চলিক সুবিধা অর্জনে সাহায্য করা।
- স্বল্প বিনিয়োগের পরিষেবা উদ্যোগ: ডিজিটাল সংযোগ বৃদ্ধির ফলে গ্রাফিক ডিজাইন এবং অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং-এর মতো স্বল্প বিনিয়োগের পরিষেবা ব্যবসা বাড়ছে।
- খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ: এই খাত ফসলের অপচয় রোধ করে গ্রামীণ পর্যায়ে মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি করছে।

গ্রামীণ অর্থনীতির এই নবজাগরণে দুটি প্রধান চ্যালেঞ্জ রয়েছে:

১. অর্থায়নের অপ্রতুলতা (Credit Gap): প্রথাগত ঋণ ব্যবস্থায় গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের পর্যাপ্ত জামানত বা ক্রেডিট স্কোর না থাকায় একটি উল্লেখযোগ্য ঋণ ব্যবধান বিদ্যমান।

২. ডিজিটাল বিভাজন: গ্রামীণ এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগের সংখ্যা বাড়লেও কার্যকর ব্যবহারের ক্ষেত্রে ডিজিটাল সাক্ষরতা, স্থানীয় ভাষায় বিষয়বস্তুর অভাব এবং ই-কমার্স/ফিনটেক প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারের দক্ষতার অভাব একটি বড় বাধা।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ওপেন ক্রেডিট এনেবলমেন্ট নেটওয়ার্ক (OCEN)-এর মতো ডিজিটাল সমাধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইন্ডিয়া স্ট্যাকের ওপর নির্মিত এই API-ভিত্তিক ডিজিটাল পরিকাঠামোটি ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করে ঋণদান কার্যক্রমকে স্ট্রিমলাইন করে। SHG-এর মাধ্যমে তৈরি হওয়া আর্থিক ট্রেইল ব্যবহার করে OCEN দ্রুত এবং কম জামানতে ঋণ দিতে পারে, যা গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক করতে পারে।

এছাড়াও, Digital MSME স্কিম এবং প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (PMKVY)-এর মাধ্যমে গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল সরঞ্জাম গ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কার্যকর গ্রামীণ বিপণন কৌশল তৈরি করতে পণ্যের অ্যাক্সেসযোগ্যতা (Accessibility), সাধ্যের মধ্যে (Affordability), সচেতনতা (Awareness), এবং গ্রহণযোগ্যতা (Acceptability)—এই চারটি অপরিহার্য দিক (4 A's) বিবেচনা করে কৌশল প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

গ্রামীণ উদ্যোগের নবজাগরণ ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং কাঠামোগত পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে। এই গতিশীলতা বজায় রাখতে হলে নীতিগত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন:

- OCEN-এর ত্বরান্বিত বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল অবকাঠামোকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।
- শহরকেন্দ্রিক নীতির ছাঁচ থেকে বেরিয়ে এসে মফস্বল-কেন্দ্রিক স্বতন্ত্র নীতি তৈরি করা উচিত।

- কেবল সংযোগ নয়, গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের জন্য নিবিড় ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।
- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং গ্রামীণ পর্যটনের মতো উচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতগুলিতে নগদ প্রণোদনা বৃদ্ধি করা উচিত।
- গ্রামীণ শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য MSME ক্লাস্টার বা গ্রোথ হাব তৈরি করা আবশ্যক।

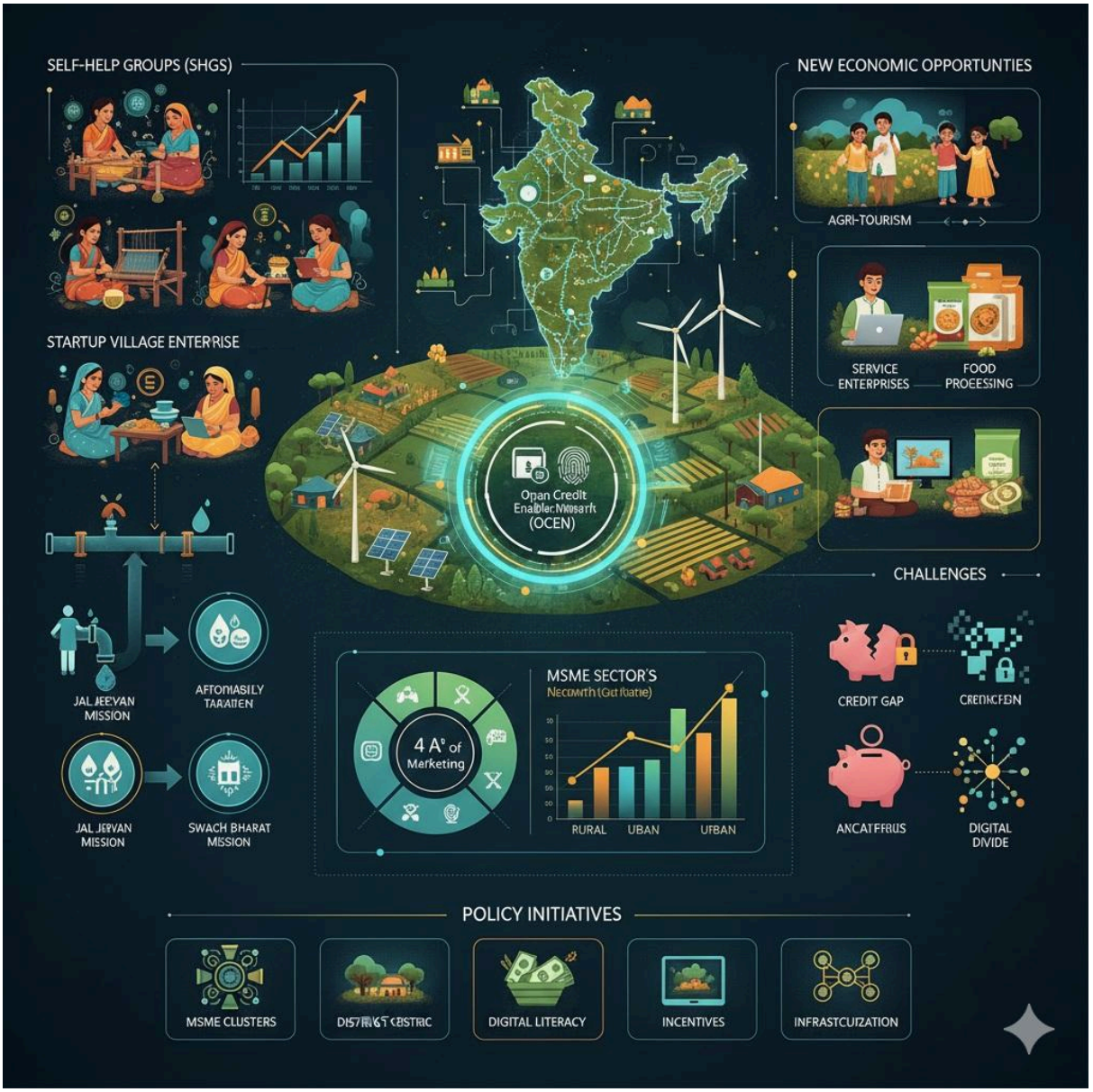

আধুনিক জীবনে প্রবীণ নাগরিক

- হৃদয় ভট্টাচার্য

বাংলা সহ ভারতের শহুরে প্রেক্ষাপটে ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ নাগরিকদের অসহায়তা বর্তমানে একটি গভীর বহুমুখী ও কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জনসংখ্যার দ্রুত বার্ধক্য (২০৫০ সালের মধ্যে মোট জনসংখ্যার ২০% প্রবীণ হওয়ার পূর্বাভাস), দ্রুত নগরায়ন এবং কর্মসংস্থানজনিত কারণে তরুণ প্রজন্মের ব্যাপক স্থানান্তরের ফলে প্রবীণরা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি এবং প্রযুক্তিগত বর্জন (Digital Exclusion)-এর শিকার হচ্ছেন। এই প্রতিবেদনটি প্রবীণদের এই গভীর মনঃসামাজিক সংকট, কাঠামোগত দুর্বলতা এবং এর মোকাবিলায় কার্যকর নীতিগত প্রতিকারের রূপরেখা প্রদান করে।

১. প্রেক্ষাপট এবং জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন

ভারতের প্রবীণ জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা স্বাস্থ্যসেবা, পেনশন ব্যবস্থা এবং সামগ্রিক সামাজিক সুরক্ষার ওপর চরম চাপ সৃষ্টি করছে। শহুরে এলাকায় একক পরিবারগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তরুণ প্রজন্মের মাইগ্রেশনের ফলে প্রবীণরা তাঁদের সন্তানের কাছ থেকে সামাজিক ও ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। এটি প্রবীণদের সমস্যাকে কেবল আর্থিক বা স্বাস্থ্যগত সমস্যায় সীমিত না রেখে এটিকে একটি গভীর সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সমস্যায় রূপান্তরিত করেছে।

লিঙ্গভিত্তিক অসমতা: বার্ধক্যে মহিলাদের সংখ্যাধিক্য ('Feminization of Ageing') দেখা যায়। প্রবীণ নারীরা, বিশেষত বিধবা অথবা একক জীবনযাপনকারী মহিলারা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং আর্থিক অনিশ্চয়তার গুরুতর ঝুঁকিতে থাকেন। অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রবীণদের জন্য সরকারি পেনশন কভারেজ এখনও মাসিক ₹৭৫ থেকে ₹১৫০-এর মতো অপ্রতুল পরিসরে আটকে রয়েছে, যা তাঁদের অবদানকে অস্বীকার করে সমাজের বোঝা হিসেবে দেখানোর দুর্বল নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

২. মনঃসামাজিক সংকট এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা

আধুনিক শহুরে জীবনে প্রবীণদের অসহায়তার সবচেয়ে তীব্র প্রকাশ হলো নিঃসঙ্গতা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা (Social Isolation), যা ভারতে প্রবীণদের মধ্যে ১৮.৩% থেকে সর্বোচ্চ ৩৭.৬% পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এটিকে জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

- পারিবারিক সম্পর্কের অবক্ষয়: যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে একক পরিবার গঠন হওয়ায় প্রবীণরা প্রায়শই অবহেলা, অযত্ন, লাঞ্ছনা এবং নিগ্রহের শিকার হন। পারিবারিক সংঘাত (৭৩.৩%) প্রবীণদের মধ্যে আবেগমূলক সমস্যার সবচেয়ে বড় কারণ।
- 'বোঝা হওয়ার মনস্তত্ত্ব': যখন পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্যরা মনে করেন যে প্রবীণ ব্যক্তিরা তাঁদের ওপর নির্ভরশীল বোঝা, তখন এটি প্রবীণদের আত্মসম্মান ও মর্যাদায় তীব্র আঘাত হানে। এর ফলে তাঁরা নিঃসঙ্গভাবে মৃত্যুর প্রহর গুনতে বাধ্য হন বা শেষ জীবনে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে বাধ্য হন।
- প্রবীণ মহিলাদের অরক্ষিততা: ভারতে প্রায় ৯৫ শতাংশ বয়স্ক মহিলা ডিজিটালভাবে নিরক্ষর, যা তাঁদের আর্থিক অনিশ্চয়তার পাশাপাশি সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকি বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। জনকল্যাণ পরিষেবাগুলি ডিজিটালি স্থানান্তরিত হওয়ায় তাঁদের অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ে এবং প্রযুক্তি তাঁদের আরও প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন করে তোলার ঝুঁকি তৈরি করে।
- প্রজন্মের ব্যবধান ও মর্যাদার সংকট: প্রযুক্তি এবং গ্যাজেটের ব্যাপক প্রভাবের কারণে প্রবীণ এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সংযোগের অভাব তৈরি হচ্ছে। প্রায় ৮৫% প্রবীণ মনে করেন, পরিবারের ছোট সদস্যরা তাঁদের এড়িয়ে চলেন। তাঁরা পরিবারের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রদানে উপেক্ষিত হন, যা তাঁদের সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে মর্যাদা কেড়ে নেয়।

৩. অর্থনৈতিক চাপ, স্বাস্থ্যসেবার ব্যবধান ও কাঠামোগত দুর্বলতা

৩.১. আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা

অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করা বিপুল সংখ্যক প্রবীণ নাগরিকের জন্য সরকারি পেনশন কভারেজ অত্যন্ত অপ্রতুল। কর্মসংস্থান না থাকায় তাঁরা পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্যদের ওপর নির্ভরশীল, যা তাঁদের আত্মসম্মান ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে। অর্থনৈতিক সঙ্কট বা পারিবারিক আয় হ্রাসের মতো বাহ্যিক কারণে তাঁরা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং অর্থের অভাবে ওষুধ বা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে পারেন না। নীতিগত ক্ষেত্রে ৬০-ঊর্ধ্ব কর্মহীন প্রবীণ পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট আর্থিক সহায়তার অভাব এই গোষ্ঠীর নির্ভরশীলতার চ্যালেঞ্জকে উপেক্ষা করে।

৩.২. স্বাস্থ্যসেবার প্রবেশগম্যতা এবং জেরিয়াট্রিক যত্নের ঘাটতি

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণদের উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগসহ ইত্যাদি অসংক্রামক রোগে (NCDs) আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। পিতামাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের ভরণপোষণ ও কল্যাণ আইন, ২০০৭ (MWPSC Act, 2007) অনুযায়ী রাজ্য সরকারের উপর প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

- আইনি বাধ্যবাধকতা: এই আইন অনুযায়ী, সরকারি হাসপাতালগুলিতে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পর্যাপ্ত শয্যা, পৃথক কিউ ব্যবস্থা এবং প্রতিটি জেলা হাসপাতালে জেরিয়াট্রিক কেয়ারে অভিজ্ঞ মেডিকেল অফিসারের নেতৃত্বে নির্দিষ্ট জেরিয়াট্রিক ইউনিট (১০ শয্যার ওয়ার্ড) নিশ্চিত করতে হবে।
- বাস্তবে ঘাটতি: পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিমার কভারেজ দিলেও, বিশেষায়িত জেরিয়াট্রিক যত্নের ক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। জেরিয়াট্রিক যত্নে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মেডিকেল অফিসার এবং নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের অপ্রতুলতার কারণে শয্যাশায়ী প্রবীণরা যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন না।

৪. প্রযুক্তিগত বর্জন এবং ডিজিটাল অসমতা

শহুরে জীবনে প্রযুক্তির অপ্রতুলতা প্রবীণদের জন্য একটি নতুন এবং গুরুতর কাঠামোগত অসহায়তার কারণ, যা 'ধূসর ডিজিটাল বিভাজন' (Grey Digital Divide) নামে পরিচিত।

- ডিজিটাল নিরক্ষরতার মাত্রা: এজওয়েল ফাউন্ডেশনের সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ বয়স্ক ব্যক্তি ডিজিটালভাবে নিরক্ষর, যার মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ বয়স্ক মহিলা। এটি বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক পটভূমির মতো একাধিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
- বহুমাত্রিক অসহায়তা: ডিজিটাল নিরক্ষরতা প্রবীণদের সরকারি জনকল্যাণ পরিষেবা (যেমন বার্ধক্য ভাতা দাবি বা টিকিট বুকিং) থেকে বর্জন করে এবং তাঁদের অন্যদের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। ৭৫ শতাংশেরও বেশি ডিজিটালভাবে নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তি অনুভব করেন যে এই অভাব তাঁদের সুস্থতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং বিচ্ছিন্নতা ও প্রান্তিকীকরণের কারণ হয়।
- সুরক্ষার ঝুঁকি: প্রবীণ ব্যক্তিরা প্রায়শই ডিজিটাল স্ক্যাম এবং অনলাইন আর্থিক জালিয়াতির শিকার হন, যা তাঁদের সীমিত অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে আরও ঝুঁকির মুখে ফেলে।
- নীতিগত ফাঁক: ভারত সরকারের ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযান বা অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রকল্পগুলি সাধারণত ৬০ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনসংখ্যার জন্য একটি নীতিগত ফাঁক তৈরি করেছে।

৫. প্রতিকারের বর্তমান সচেষ্টতা এবং কাঠামোগত দুর্বলতা

৫.১. পিতামাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের ভরণপোষণ ও কল্যাণ আইন, ২০০৭ (MWPSC Act)

MWPSC Act, 2007 সন্তানেরা যেন প্রবীণ পিতামাতা ও আত্মীয়দের ভরণপোষণ প্রদান করে, তা আইনি বাধ্যবাধকতার মধ্যে এনেছে। এর মূল বিধানগুলি হলো:

আইনি বাধ্যবাধকতা (MWPSC Act)	বিধানের উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নে বর্তমান ব্যবধান (বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষণ)
ভরণপোষণ ট্রাইব্যুনাল (Section 5)	দ্রুত, সহজ ও কম খরচে ভরণপোষণ নিশ্চিত করা।	প্রক্রিয়া এখনও বিলম্বিত এবং জটিল; ট্রাইব্যুনালের কার্যকারিতা নিয়ে সচেতনতার অভাব।
জেরিয়াট্রিক স্বাস্থ্যসেবা (Section 20)	সরকারি হাসপাতালে নির্দিষ্ট ওয়ার্ড, পৃথক কিউ।	জেরিয়াট্রিক মেডিসিনে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব; নির্দিষ্ট ১০ শয্যার ওয়ার্ড কার্যকরভাবে চালু না হওয়া।

সম্পত্তি হস্তান্তর প্রত্যাহার (Section 23)	যত্নের বিনিময়ে হস্তান্তরিত সম্পত্তির মালিকানা প্রত্যাহার।	এই ধারা কার্যকর করার জন্য ব্যাপক আইনি প্রচার এবং ট্রাইব্যুনালের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা।

MWPSC Act একটি শক্তিশালী আইন হওয়া সত্ত্বেও, তৃণমূল স্তরে এর প্রশাসনিক সংবেদনশীলতা ও প্রচারের অভাব এবং বিচার প্রক্রিয়ার জটিলতা এর কার্যকারিতাকে সীমিত করেছে।

৫.২. সম্প্রদায়-ভিত্তিক সুরক্ষা মডেল: 'প্রণাম' উদ্যোগ

কোলকাতা পুলিশ, দ্য বেঙ্গল এবং ডিগনিটি ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত 'প্রণাম' (PRONAM) প্রকল্প প্রবীণদের নিরাপত্তা ও মনস্তাত্ত্বিক কল্যাণের ক্ষেত্রে একটি সফল পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেল হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে:

- নিরাপত্তা ও সুরক্ষা: কোলকাতা পুলিশের লিয়াজোঁ টিম প্রবীণ সদস্যদের বাড়িতে নিয়মিত পরিদর্শন করে নিরাপত্তা নিরীক্ষা পরিচালনা করে।
- মনস্তাত্ত্বিক কল্যাণ ও চিকিৎসা সহায়তা: নেটওয়ার্কের মধ্যে ডাক্তার এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যুক্ত রয়েছে, যারা জরুরি চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে এবং বিনোদনমূলক কর্মসূচির আয়োজন করে।
- আইনি সহায়তা: বিনামূল্যে আইনি পরামর্শও প্রদান করা হয়।

'প্রণাম' মডেলের সাফল্য প্রমাণ করে যে শহুরে প্রবীণরা শুধু অর্থ বা চিকিৎসা চান না; তাঁরা চান অপরাধের ভয় থেকে মুক্তি এবং সামাজিক সংযুক্ততা।

৬. আশু প্রতিকার এবং প্রগতিশীল নীতিগত সুপারিশমালা

প্রবীণ নাগরিকদের বহুমুখী অসহায়তা দূরীকরণের জন্য একটি সামগ্রিক, চাহিদা-ভিত্তিক এবং প্রগতিশীল নীতিগত হস্তক্ষেপের প্রয়োজন।

৬.১. মনঃসামাজিক পুনর্গঠন এবং সংহতি

- আন্তঃপ্রজন্ম যোগাযোগ বৃদ্ধি (Inter - Generational Bonding): স্কুল ও কলেজ স্তরে বাধ্যতামূলক সামাজিক কর্মসূচি চালু করা আবশ্যক। 'রিভার্স মেন্টরিং' প্রোগ্রাম চালু করা যেতে পারে, যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রবীণদের ডিজিটাল দক্ষতা শেখাবে এবং প্রবীণরা তাঁদের জীবন ও জ্ঞানের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবেন, যা তাঁদের মর্যাদা ফিরিয়ে দেবে।
- লক্ষ্যভিত্তিক কাউন্সেলিং: এল্ডারলাইন (১৪৫৬৭) এর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারদের সাথে সংযোগ স্থাপন করা এবং প্রতিটি পৌরসভা সেন্টারে মাসিক প্রবীণদের মানসিক স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং ক্যাম্প এবং গোষ্ঠী থেরাপির ব্যবস্থা করা।

৬.২. ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি নীতি এবং স্বাবলম্বীতা

- লক্ষ্য-ভিত্তিক ডিজিটাল প্রশিক্ষণ (Targeted Digital Literacy): পৌরসভা এবং আইসিটি-সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে প্রবীণদের (বিশেষত মহিলাদের) জন্য বিনামূল্যে, ব্যবহারিক এবং চাহিদা-ভিত্তিক ডিজিটাল প্রশিক্ষণ চালু করা প্রয়োজন। এই প্রশিক্ষণে অনলাইন আর্থিক লেনদেন, ডিজিটাল স্ক্যাম সনাক্তকরণ এবং সরকারি পরিষেবা অ্যাক্সেস করার পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- এল্ডারলাইন সাপোর্ট ডেস্কের সম্প্রসারণ: এল্ডারলাইন ১৪৫৬৭-এর মাধ্যমে ২৪x৭ মানব-চালিত হেল্পডেস্ক তৈরি করা উচিত, যাতে ডিজিটালাইজেশনের কারণে প্রবীণরা পরিষেবা পেতে অন্যদের উপর নির্ভরশীল না হন।

৬.৩. স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালীকরণ এবং জেরিয়াট্রিক যত্নের সম্প্রসারণ

- MWPSC আইনের ধারা ২০ এর কঠোর প্রয়োগ: রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে প্রতিটি জেলা হাসপাতালে জেরিয়াট্রিক ওয়ার্ড (১০ শয্যা) সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করতে হবে এবং জেরিয়াট্রিক কেয়ারে অভিজ্ঞ মেডিকেল অফিসার নিশ্চিত করতে হবে।

- NCDs-এর জন্য সক্রিয় স্ক্রিনিং: উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগের মতো অসংক্রামক রোগগুলির জন্য শহুরে বস্তি এবং কলোনিগুলিতে নিয়মিত স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং কর্মসূচি চালু করা এবং স্বল্প আয়ের প্রবীণদের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করা উচিত।

৬.৪. আইনি ব্যবস্থার দ্রুতায়ন এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষা

- MWPSC ট্রাইব্যুনালের সংস্কার: ট্রাইব্যুনাল প্রক্রিয়াকে দ্রুত এবং প্রবীণদের জন্য কম ব্যয়বহুল করতে প্রশাসনিক সংস্কার আনা উচিত।
- আর্থিক সহায়তার পুনর্বিবেচনা: অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে অবসর নেওয়া বা কর্মসংস্থানহীন প্রবীণ পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য বার্ধক্য ভাতার পরিমাণ জাতীয় মানদণ্ড অনুযায়ী বৃদ্ধি করা জরুরি।
- প্রণাম মডেলের সম্প্রসারণ: কোলকাতা পুলিশের 'প্রণাম' মডেলকে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বৃহত্তর পরিসরে রাজ্যের অন্যান্য শহরাঞ্চলে (Tier-II/III cities) সম্প্রসারণ করা উচিত।

৭. উপসংহার

বাংলার আধুনিক শহর জীবনে প্রবীণ নাগরিকদের অসহায়তা একটি বহুমুখী ও কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যার সমাধানে মনঃসামাজিক, আইনি, প্রযুক্তিগত এবং স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রণামের মতো স্থানীয় মডেলের সম্প্রসারণ, MWPSC আইনের কঠোর বাস্তবায়ন এবং বয়স্ক মহিলাদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি—এই তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে নীতিগত অগ্রাধিকার দেওয়া হলে শহুরে প্রবীণদের অসহায়তা দ্রুত নিরসন করা সম্ভব। প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে সমাজের বোঝা হিসেবে না দেখে তাঁদের সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে মর্যাদা ও অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াই প্রগতিশীল নীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

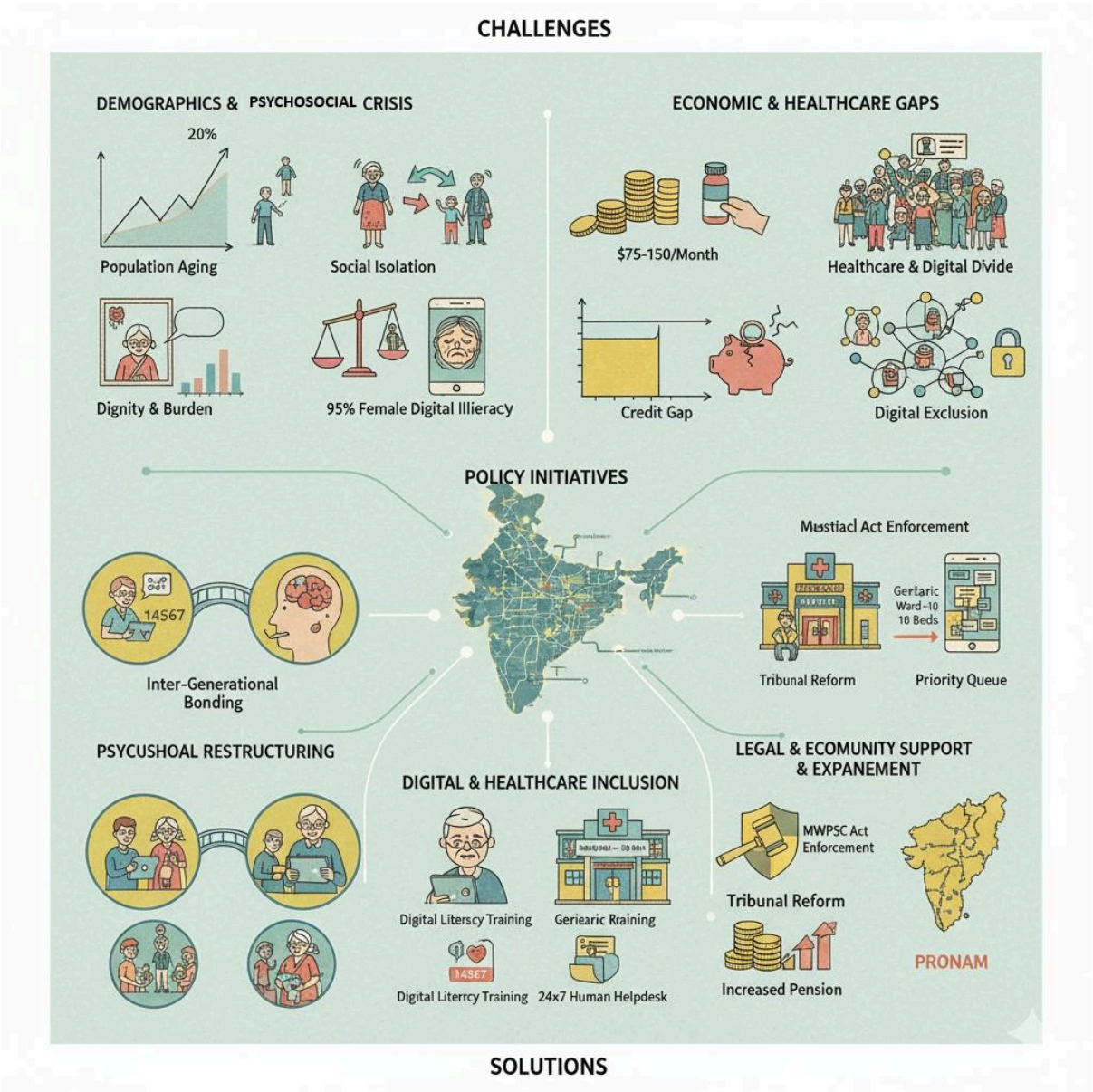

যে শহর ঘুমোয় না

- আর্যা সরকার

রাতের শেষে যখন বাতিগুলোও ক্লান্ত,
আকাশের বুক ছুঁয়ে চলে যায় একলা ট্রাম,
শহর তখনও জেগে থাকে —
পাথরের শরীরে লেগে থাকা মানুষের নিঃশ্বাসে।

একটা হালকা হর্ন, দূরে ট্রাকের গর্জন,
চায়ের দোকানের উনুনে লাল আগুন—
শহর ঘুমোয় না,
চোখ বন্ধ করে স্বপ্ন দেখে অন্যভাবে।

বৃষ্টির ধোঁয়ায় ভিজে থাকা ফুটপাত,
ছেঁড়া পোস্টারে পুরোনো মুখ,
ফুটপাতিনার হাতে ধরা খাবার ভরা বাটি—
আলো ঝলমলে ট্যাক্সি থেমে যায় সিগনালে,
যেন সময়ও এখানে আটকে গেছে
অসম জীবনের মাঝখানে।

নদীর ধারে বসে থাকা কিছু যুবক
গিটার হাতে গাইছে প্রার্থনা,
তাদের চোখে ঘুম নেই—
স্বপ্ন আছে, অস্থিরতা আছে,
এক টুকরো ভালোবাসার অভাবও আছে।

এই শহর জানে কেমন করে
রাতকে পকেটে ভরে সকাল বানাতে হয়।
পাকা চোর, ব্যর্থ কবি, সফল প্রেমিক, বিগত অটোরিকশাচালক—
সবাই একসঙ্গে বেঁচে থাকে এখানে,
ভিন্ন ভিন্ন সুরে বাজে একটাই রাগ—
বেঁচে থাকার।

যে শহর ঘুমোয় না,
সেই শহরের বুকেও ক্লান্তি জমে,
ভোর হলে বাজে কফিশপের বন্ধের ঘণ্টা,
মেট্রো নামে অন্ধকারের তলদেশ থেকে,
একফোঁটা সূর্যালোক
টালিগঞ্জ থেকে ভবানীপুর হয়ে দমদম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে—
একই ছন্দে, একই যন্ত্রণায়, একই প্রেমে।

তুমি যদি একদিন এই শহরের গলিতে হাঁটো,
সেক্টর ফাইভ থেকে ময়দান যাত্রাপথে দেখবে—
ঘুমহীন এই শহর আসলে এক বিশাল হৃদয়,
যেখানে প্রতিটি রাত
একটি নতুন কবিতার জন্ম দেয়।

✍️ পাঠকের কলম / পাঠকপত্র

🖊️রচনা প্রতিযোগিতা: “আমার পৃথিবী” , নিজের চোখে দেখা পৃথিবীর গল্প — হতে পারে তা কোনো স্মৃতি, অনুভব, স্বপ্ন বা বাস্তব অভিজ্ঞতা। সর্বাধিক শব্দসংখ্যা: ৭০০।

💌 এই সংখ্যার পাঠকপত্র, আমাদের প্রকাশিত লেখাগুলি নিয়ে আপনার মতামত জানান। শব্দসীমা: ১০০।

🥇 নির্বাচিত লেখা অনলাইন ম্যাগাজিনের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে, এবং লেখকদের ই-সার্টিফিকেট পাঠানো হবে।

ফাইল ফরম্যাট: .doc / .docx / .pdf

📩 ই-মেইল পাঠানোর ঠিকানা: dbss2000in@proton.me

📮 পাঠানোর শেষ তারিখ: ০১ নভেম্বর ২০২৫